উৎস

রায় শ্রীজলধর সেন বাহাদুর

শরচ্চন্দ্র চক্রবর্ত্তী এণ্ড সন্স্
মাণিকতলা স্পার, কলিকাতা

আষাঢ়—১৩৩৯

এক টাকা

প্রকাশক—শ্রীকালীকৃষ্ণ চক্রবর্ত্তী, শরচ্চন্দ্র চক্রবর্ত্তী এণ্ড সন্স, ২১, নন্দকুমার চৌধুরী লেন
প্রিণ্টার—শ্রীক্ষেত্রমোহন দালাল, কালিকা প্রেস, ২১, নন্দকুমার চৌধুরী লেন, কলিকাতা

উপহার
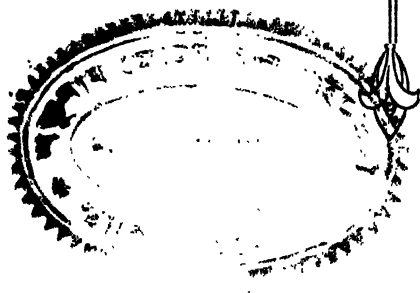
একটি কথা

'গল্প-লহরী'র সম্পাদক শ্রীমান্ শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ১৩৩৮ সালের বৈশাখ সংখ্যা 'গল্প-লহরী'র জন্য আমার কাছে একটা ছোট গল্প চান; আমিও দিতে প্রতিশ্রুত হই। নির্দ্দিষ্ট সময়ে তিনি উপস্থিত হ'লে আমি তাঁকে অসম্পূর্ণ একটু লেখা দেখাই; তিনি তাই নিয়ে যান; পরবর্ত্তী সংখ্যায় শেষ ক'রে দেব, এই ছিল আমার কল্পনা। কিন্তু, আমি কথা রক্ষা করতে পারলাম না, 'টিউব-ওয়েল' নামক গল্প মাসের পর মাস চল্‌তে লাগল এবং ১৩৩৯ সালের আষাঢ়ে শেষ হোলো। সুতরাং ছোট গল্প ত হোলোই না, উপন্যাসও হোলো না—যা হোলো, তা এই।

গল্পটার নাম ছিল 'টিউব-ওয়েল'; দুই চারিজন বন্ধু নামটা বদল করতে বল্‌লেন; তাই এখন নাম দেওয়া গেল 'উৎস'—অন্ধের নাম পদ্মলোচন!

মলাটের উপরের ছবিখানি সুপ্রসিদ্ধ চিত্র-শিল্পী শ্রীমান্ যতীন্দ্রকুমার সেন ভায়া এঁকে দিয়ে এই বইখানির সৌষ্ঠব সাধন করেছেন; এর জন্য তাঁকে নয়, আমাকেই ধন্যবাদ করছি।

আষাঢ়
১৩৩৯

শ্রীজলধর সেন

উৎস

এক

(যোগেন্দ্রবাবুর কথা)

তেরশ’ পঁয়ত্রিশ সালের বৈশাখ মাস।

আমার একজন বিশিষ্ট বন্ধুর একখানি অনুরোধ-পত্র নিয়ে আঠারো-উনিশ বছর বয়সের একটী যুবক আমার কাছে উপস্থিত হোলো। পত্রখানি পড়ে দেখ্‌লাম, বন্ধু এই যুবকটীর একটা চাকরী ক’রে দেবার জন্য অনুরোধ করেছেন। তিনি লিখেছেন, ছেলেটীর নাম রমেশচন্দ্র দাস; মাহিষ্যের ছেলে; মেদিনীপুর বাঙ্গালা স্কুল থেকে ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষায় পাশ করেছে; ইংরাজীও সামান্য কিছু জানে। যখন মেদিনীপুরে পড়ত, তখন সেখানে আমার বন্ধুর আশ্রয়েই রমেশ ছিল। বন্ধুর একটা ছোটখাটো প্রেস ছিল। রমেশ তার অবকাশ সময়ে সেই প্রেসে কম্পোজ করা শিখ্‌ত। সে ইংরাজী বাঙ্গালা বেশ কম্পোজ করতে পারে; হাতও খুব চলে। দেখে বোধ হোলো, ছেলেটী অতি সচ্চরিত্র ও বিনয়ী।

পত্রখানি পড়া শেষ ক’রে রমেশকে জিজ্ঞাসা কর্‌লাম, সে আরও পড়াশুনা না ক’রে চাকরীর খোঁজে বেরিয়েছে কেন?

রমেশ বল্‌ল, আমার নর্ম্যাল ত্রৈবার্ষিক পরীক্ষা দেওয়ার ইচ্ছে

ছিল ; কিন্তু, গেল বৈশাখ মাসে বাবা মারা যাওয়ায় সে সঙ্কল্প ত্যাগ কর্‌তে হয়েছে।

জিজ্ঞাসা করলাম, বাড়ীতে তোমার আর কে আছেন ?

রমেশ বল্‌ল, বিধবা মা, আর বিধবা নিঃসন্তান এক বড় দিদি আছেন ; আর কেউ নেই।

বল্‌লাম, তোমরা ত তিনটী মানুষ, তার মধ্যে আবার দু'জন বিধবা। তোমাদের কি এমন কিছু নেই, যাতে এই তিনটী মানুষের ছোট সংসার চলে।

রমেশ বল্‌ল, সামান্য যা কয়েক বিঘে জমি আছে, নিতান্ত অজন্মা না হ'লে তাতে কোন রকমে চ'লে যায়, কষ্ট হয় না। তা হ'লেও আমার কিছু উপার্জ্জন করা দরকার। মেদিনীপুরের প্রেসে কম্পোজের কাজ আমি শিখেছিলাম। মেদিনীপুরে হরেন্দ্রবাবুর কাছেই ছিলাম ; তিনিই তাঁর প্রেসে আমাকে কাজ শিখিয়েছিলেন। তাঁর প্রেস ত বড় নয়, কাজকর্ম্মও তেমন বেশী নয়। তাই, তাঁর ওখানে কাজের সুবিধে হবে না ব'লে আমাকে আপনার কাছে পাঠিয়েছেন। আপনার সঙ্গে অনেক প্রেসওয়ালার জানাশোনা আছে ; একটু দয়া করলেই আমার একটা কাজ হয়ে যেতে পারে।

আমি বল্‌লাম, তুমি যদি অন্য কোন কাজ পাবার আশায় এখানে আস্‌তে, তা হ'লে তোমাকে পত্রপাঠ বিদায় ক'রে দিতাম। কাজকর্ম্ম এখন মেলে না ; কিন্তু, তুমি প্রেসের কাজ জান ; তোমার একটা কিছু ঠিক করে দিতে পার্‌ব, এ আশা তোমাকে দিতে পারি। কিন্তু, তার জন্যেও ত দু'-চারদিন অপেক্ষা কর্‌তে হবে, আমাকে সন্ধান কর্‌বার সময় দিতে হবে।

রমেশ বলল, সে ত হবেই।

আমি বল্লাম, তুমি এখানে কবে এসেছ ?

রমেশ বল্ল, আজই এসে ষ্টেসন থেকে সোজা আপনার কাছে এসেছি। এখানে আমার চেনা লোক কেউ নেই। কলকাতায় আমি এর আগে কখন আসি নি। রেলে একজন কলেজের ছেলের সঙ্গে আলাপ হোলো। তাঁকে বল্তে, তিনিই আমাকে আপনার বাড়ীতে এনে দিয়ে গেলেন ; তা না হ'লে এত বড় সহরে পথ চিনে আমি হয় ত আস্তেই পার্তাম না। আপনি কোথাও আমার থাক্‌বার একটা স্থান ঠিক করে দেন। আমার কাছে ছ'টী টাকা আছে। তাই দিয়ে বাসাখরচ চালাতে চালাতে আপনার দয়ায় একটা কিছু ঠিক হয়েই যাবে। আমি না হয় এক বেলা উপবাসই কর্‌ব। তাতে কি এই ছয় টাকায় দিনকয়েক চল্‌বে না ? এখানে নাকি খরচ খুব বেশী লাগে, তাই আপনাকে জিজ্ঞাসা কর্‌ছি। বাড়ী থেকে আর টাকা আন্‌তে পার্‌ব না ; তা হ'লে মা আর দিদির কষ্ট হবে।

রমেশ যখন এই কথাগুলো বল্‌ছিল, আমি তখন তার মুখের দিকে চেয়ে দেখ্‌লাম, ছেলেটী সত্যসত্যই সুবোধ ও বিনয়ী। তার কথা শুনে আমার বড়ই তৃপ্তি বোধ হ'ল। আমি বল্‌লাম, দেখ রমেশ, যে ক'দিন তোমার কাজকর্ম্ম না হয়, সে ক'দিন আমার এখানে থাকতে তোমার কি কোন আপত্তি আছে ?

রমেশ একটু চুপ ক'রে থেকে হাতযোড় ক'রে বল্‌ল, সে কি ক'রে হবে ? শুনেছি, এখানে খরচ বড় বেশী। আমার জন্য আপনি এত খরচ কর্‌বেন কেন ? সে হয় না। আপনি দয়া ক'রে আমার

একটা কাজ ঠিক ক'রে দেবেন, এই ঋণই যে আমি শোধ কর্‌তে পার্‌ব না। আপনি একটা যে কোন স্থান ঠিক ক'রে দেন। আমার ছ'টা টাকাতে যদি না কুলোয়, তখন না হয় আপনার কাছে কিছু ধার নেব, কাজ হ'লে শোধ কর্‌ব।

আমি বল্‌লাম, সে কথা পরে হবে। আমি ত তোমাকে স্থায়ীভাবে এখানে থাক্‌তে বল্‌ছি নে যে, তুমি কুণ্ঠা বোধ কর্‌ছ। যে ক'দিন কাজ না পাচ্ছ, সেই ক'দিন আমার এখানে থাক; কাজ ঠিক হয়ে গেলে একটা বাসা খুঁজে নিও, আমি তখন আপত্তি কর্‌ব না।

রমেশ তার সঙ্কোচের ভাব দূর করতে পারছিল না; কি যে বল্‌বে, তাও ঠিক কর্‌তে পার্‌ছিল না; শুধু বল্‌লে—তা, তা, সে কি ক'রে হবে।

আমি হেসে বল্‌লাম, সে যা ক'রে হয়, তা তোমাকে ভাব্‌তে হবে না। তুমি ভাবছ, তোমায় দু-বেলা দুটো খেতে দিতে আমার অতিরিক্ত খরচ হবে, কেমন? তুমি ছেলেমানুষ, ঘরগৃহস্থালী ত কর নি। পনের জনের সঙ্গে অতিরিক্ত দু-একজন যোগ দিলে গৃহস্থের খরচ বাড়ে না, ওইতেই চলে যায়। তুমি আপত্তি করো না, আমার এখানেই দিনকয়েক থাক। আমিও গরিব মানুষ, তুমিও গরিবের ছেলে; আমার সামান্য শাকভাতে তোমার কষ্ট হবে না, তাই ভেবেই তোমাকে অনুরোধ কর্‌তে সাহস করেছি।

কি যে আপনি বলেন, ব'লে রমেশ আমার পায়ের ধূলা নিতে এল; আমি তার হাত চেপে ধরে বল্‌লাম, প্রণাম কর্‌তে হবে না, অমনিই আশীর্ব্বাদ কর্‌ছি দীর্ঘজীবন লাভ করো, ধর্ম্মে মতি হোক্।

তিন-চারদিন পরেই মীরা প্রেসে রমেশের একটা চাকুরী ঠিক করে দিলাম। প্রেসের কর্ত্তারা বল্‌লেন, এক সপ্তাহ কাজ দেখে তবে মাইনে ঠিক করে দেবেন।

এই চারদিনের মধ্যেই রমেশ আমার বাড়ীর সকলের আপনার জন হয়ে পড়েছিল। হঠাৎ কোন অপরিচিত লোক এলে বুঝ্‌তেই পার্‌ত না যে, রমেশ এ বাড়ীর ছেলে নয়। এই চারদিনে বাড়ীর সব কাজে রমেশ; মনে হয় সে যেন দশ বছর এই বাড়ীতে আছে। আমার গৃহিণী তার ব্যবহারে একেবারে মুগ্ধ হ'য়ে গেলেন; ছেলেপিলে বউ-ঝি সকলেরই সে আপনার জন হয়ে গেল। এমন সুন্দর ছেলে আমি ত কোনদিন দেখি নি। কোন একটা কাজ কর্‌তে গেলে গৃহিণী যদি বলেন, থাক্ বাবা, ওরা কর্‌বে। রমেশ অমনি ব'লে ওঠে, ওরা করবে কেন মা, দিন না পয়সা, আমি বাজার থেকে এনে দিচ্ছি। সারাদিন সে এ-কাজ ও-কাজ নিয়েই আছে।

যেদিন তাকে সঙ্গে নিয়ে মীরা প্রেসে কাজ ঠিক করে দিলাম, সেদিন বাড়ীতে এসেই আমার গৃহিণীকে বল্‌ল, মা, বাবু আমার কাজ ঠিক ক'রে দিয়েছেন; কাল থেকে বেরুতে হবে।

গৃহিণী বল্‌লেন, বেশ হয়েছে। মাইনে কত পাবে বাবা?

রমেশ বল্‌ল, মাইনে কি এখনই ঠিক হয়! কাজ দেখে তবে মাইনে ঠিক হবে। তাঁরা বলেছেন, সাতদিন আমার কাজ দেখে তারপরে বল্‌বেন আমি কত টাকা মাইনে পাবার উপযুক্ত। সে ত ঠিক কথা, কি বলেন মা!

গৃহিণী বল্‌লেন, তা হ'লে এখনও পাকা হয় নি। সাতদিন পরে

যদি তাঁরা বলেন, না, তোমার দিয়ে কাজ চল্‌বে না, তা হ'লে ত চ'লে আস্‌তে হবে।

রমেশ হেসে বল্‌ল, তা আর বল্‌তে হবে না মা, আপনি দেখে নেবেন। আমি খুব ভাল কম্পোজ করতে পারি, কি বাঙ্গালা কি ইংরেজী। তবে কি জানেন মা, আমি ত স্কুলে ইংরেজী পড়ি নি, বাড়ী ব'সে একটু-আধটু পড়েছি, তাও সেই রয়াল রিডার নম্বর থ্রি পর্য্যন্ত। সে আর কতটুকু। তাই ইংরেজী হাতের লেখা যদি জড়ানো হয়, তা হ'লে ভাল পড়্‌তে পারিনে, কম্পোজ করতে একটু দেরীও হয়, আর ভুলও হয়। কিন্তু বাঙ্গালা কম্পোজে আমি ডরাই নে মা! আপনাকে একদিন আমার প্রুফ এনে দেখাব, দেখ্‌বেন, ভুল হয় ত একটা-আধটা। তা মা, তাড়াতাড়ি কম্পোজ করতে গেলে আর একটা-আধ্‌টা ভুল হবে না, কি বলেন মা!

গৃহিণী বল্‌লেন, সে ত ঠিক কথা। আচ্ছা, তুমি কত মাইনে আশা কর বাবা?

রমেশ বল্‌ল, আমি তা কি ক'রে বল্‌ব, আমি তা জানি নে। সাতদিন পরে তাঁরা বাবুকে বল্‌বেন; তিনি যদি তাতে স্বীকার হন, কাজ করব। সে কথা থাক্ মা, আমি বল্‌তে এসেছি কি— না, এখন থাক্, কেমন মা?

গৃহিণী বল্‌লেন, কি তোমার কথা রমেশ?

রমেশ বল্‌ল, বল্‌লাম যে এখন থাক।

আমি বল্‌লাম, বলই না তোমার মনের কথাটা কি?

রমেশ বল্‌ল, আপনি ত বলেছিলেন, কাজ ঠিক হ'লেই আমার একটা বাসা ঠিক ক'রে দেবেন। কাজ ত হোলো; এখন বাসার কি

হবে ? মীরা প্রেসের একজন কম্পোজিটর বল্‌ছিল, তারা গোয়াবাগানে না কোথায় একটা ঘর ভাড়া করে তাতে পাঁচজন থাকে ; নিকটেই একটা হোটেল আছে, সেখানে দু'বেলা খায়। তাদের সেই ঘরে আরও একজনের স্থান হ'তে পারে। সে বল্‌ল, ঘরভাড়া আট টাকা লাগে ; পাঁচজনের যায়গায় ছয়জন হ'লে ভাড়াও প্রত্যেকের কম হবে। সে বল্‌ল, ঘরভাড়া, হোটেলে দু'বেলা খাওয়া, আর এটা-ওটা খরচসুদ্ধ তাদের বারো-তেরো টাকার বেশী কোন মাসেই লাগে না। সেখানেই কেন কাল থেকে যাই না। ওর থেকে কম খরচে কি আর কোথাও ব্যবস্থা হ'তে পারবে ?

আমি বল্‌লাম, যাদের সঙ্গে থাক্‌বে, তাদের স্বভাব-চরিত্র, ব্যবহার প্রভৃতি না জেনে আমি কোন কথাই—

আমার কথায় বাধা দিয়ে গৃহিণী বল্‌লেন, তারা যদি ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরও হন, কি ভগবান বুদ্ধদেবও হন, তা হোলেও তোমাকে সেখানে—আর সেখানেই বা কেন, কোনখানেই যেতে দেব না ; যে কয়দিন আমরা আছি, তোমাকে আমাদের কাছ ছাড়া করব না, এ তুমি ঠিক জেনে রেখো রমেশ !

রমেশ অবাক্ হয়ে আমার মুখের দিকে চেয়ে বল্‌ল, শুন্‌লেন বাবু, মায়ের কথা। মা কি না ; তাই না বুঝে-সুজেই ব'লে ফেল্‌লেন এক কথা। গৃহিণীর দিকে চেয়ে বল্‌ল, আমাকে কি কাজ কর্‌তে হবে জানেন মা ? সেই সকালে ন'টার সময় হাজিরা দিতে হবে, আর সন্ধ্যা ছ'টায় ছুটী। তাও সব দিন নয় ; যেদিন কাজ বেশী থাক্‌বে, সে দিন চাই কি, রাত দশটা-এগারটা পর্য্যন্ত কাজ কর্‌তে হবে। তবে কি জানেন মা, রোজ ন'টা থেকে ছ'টাই বাঁধা কাজ।

তার পরেও কাজ করলে ওভার-টাইম পাওয়া যায়। সেই সাড়ে আটটায় খেয়ে বেরুতে হবে ; ফিরতে হবে, সাড়ে ছ'টায়। এমন চাকরীর যোগান দেওয়া মা, আপনার কর্ম্ম নয়। আর বাড়ীর কাজ-কর্ম্ম যে আমি মোটেই দেখতে পারব না। সে কি ক'রে হবে বাবু, আপনিই বলুন না।

গৃহিণী বললেন, সে ভাবনা তোমায় ভাবতে হবে না ; সাড়ে আটটা কেন, আটটার মধ্যেই আর কেউ না পারুক, আমি রোজ তোমার ভাত রেঁধে দেব। তোমাকে কোন কাজকর্ম্ম দেখতে হবে না, তোমাকে কিছু করতে দেব না।

রমেশ বলল, সে কি ক'রে হবে মা ? আমি যে রোজগার করব টাকা।

গৃহিণী বললেন, বেশ ত টাকা এনে আমার কাছে দিও। আমি জমিয়ে রাখব। তারপর আমাদের যখন অভাব হবে, তখন ঐ টাকা আর তোমার রোজগারের টাকা খাব।

রমেশ হেসে বলল, মা পাগল !

গৃহিণী বললেন, পাগল নই বাবা ! এই সামান্য তিন-চারদিনেই তোমাকে আমি চিনেছি, তোমার ওপর আমার মায়া ব'সে গিয়েছে। আমার নরেশ, পরেশ, দীনেশও যেমন, তুমিও তেমনি হয়েছ। আমার এখন চার ছেলে।

রমেশ গৃহিণীর পায়ের ধুলো নিয়ে বলল, এমন কথা ত কোনদিন শুনি নি মা ! আপনি মানুষ, না দেবী !

গৃহিণী বললেন, আমি তোমার মা।

দুই

সোমবারে রমেশকে মীরা প্রেসে কাজে লাগিয়ে দিয়ে এসে-ছিলাম। প্রেসের কর্ত্তা বলেছিলেন যে, সাত দিন কাজ দেখে মাইনে ঠিক করে দেবেন।

শনিবার সন্ধ্যা সাতটা বেজে গেল, তবুও রমেশকে বাড়ী আস্‌তে না দেখে আমার গৃহিণী বল্‌লেন, কই, রমেশ ত এখনও এলো না। এ কয়দিন ছটা বেজে দশমিনিট হ'তে না হ'তেই সে বাড়ী এসেছে, কোথাও একটুও বিলম্ব করে নাই। আজ কি হলো। সহরে ত কখন আসে নাই, এখানকার কিছুই জানে না। তাই আমার সকল সময়ই ভয় হয়।

আমি একটু হেসে বল্‌লাম, তোমার রমেশ ত আট বছরের ছেলে নয়, আর তার গায়ে হাজার টাকার অলঙ্কারও নেই যে, ছেলে-ধরারা তাকে ভুলিয়ে নিয়ে যাবে। রমেশকে যে তুমি চোখের আড়াল করতে চাও না।

গৃহিণী বল্‌লেন, আহা, গরীবের ছেলে! এখানে ওকে কে দেখ্‌বে? নিতান্ত কষ্টে আর অভাবে পড়েই এই ছেলেবয়সে চাকুরী করতে এসেছে। আর ছেলেটি যে কি সুন্দর স্বভাবের, তা ত দেখ্‌তেই পাচ্ছ। এমন ছেলের উপর মায়া না হয়েই পারে না।

আমি বল্‌লাম, সে ঠিক কথা; কিন্তু তা ব'লে প্রেস থেকে

আসতে তার আধ ঘণ্টা দেরী হ'লেই যে তুমি অধীর হয়ে পড়, এও ত ভাল নয়! হয় ত আজকে তাকে ওভার-টাইমে কাজ করতে হবে। এও হ'তে পারে ত।

গৃহিণী বল্লেন, না, না, রমেশ বলেছে তাকে পাকা না করা পর্য্যন্ত ওভার-টাইমে কাজ করতে দেবে না। সেই জন্যই ত ভাবছি, সাতটা বেজে গেল, এখনও—

গৃহিণীর মুখের কথা শেষও হোলো না, রমেশ ঘরের মধ্যে প্রবেশ করেই আমার গৃহিণীকে প্রণাম করল; তার পর সেই উদ্দেশ্যেই আমার দিকে এগিয়ে আস্তে দেখে আমি তার হাত চেপে ধরে বল্লাম, কি হে রমেশ, আমি ত শুনেছি, আর দেখেছিও, কাজে বেরুবার সময় তুমি ওঁকে প্রণাম ক'রে পদধূলি নিয়ে যাও। এখন কি ওটা বাড়িয়ে দিলে? এখন নিরাপদে তোমার মায়ের কাছে ফিরে এসে প্রণাম করার ব্যবস্থা করেছ না কি?

রমেশ বল্ল, আগে আপনার পায়ের ধূলো নিই, তার পর কথা বলব। মা উপস্থিত থাক্তে ত আগে আপনার পায়ের ধূলো নিতে পারিনে! কেমন মা, তা কি ঠিক্?

আমি বল্লাম, তুমি ঠিক বলেছ। উনি হচ্ছেন, অন্নপূর্ণা, জগদ্ধাত্রী, ওঁর পূজা ত আগেই হবে। তারপর অন্য কথা।

রমেশ বল্ল, তা' আমি জানি নে, আমি জানি আগে মা, তারপর বাবা।

আমি বল্লাম, বাবা না থাকলেও চলে রমেশ। শোন নি, জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী। এর মধ্যে বাবার নাম-গন্ধও নেই।

রমেশ বল্‌ল, তা না থাকুক। মা, আপনি যে বলেছিলেন, আমার কাজ তাঁদের পছন্দ হবে না, তাঁরা আমাকে রাখবেন না। তা হয় নি মা! তা হয় নি! তাঁরা এই ছয় দিন কাজ দেখে আমাকে আজ একেবারে বহাল ক'রেছেন। আর শুনে অবাক্‌ হবেন মা, আমাকে মাসে চব্বিশ টাকা মাইনে ঠিক ক'রে দিয়েছেন, — একেবারে চব্বিশ টাকা। আমি কিন্তু মা, এত মাইনের কথা স্বপ্নেও ভাবি নি। আমি ভেবেছিলাম, বারো টাকা দেবে, আর যদি বেশী অনুগ্রহ করে, তা হ'লে পনের টাকা। তা, নয়, এ-কে-বা-রে চব্বিশ টাকা! খুব বেশী হয় নি মা, আপনিই বলুন। আর দেখুন মা, আমার প্রবল সন্দেহ হয়েছে, এই এত টাকা মাইনে দেবার ব্যবস্থার মধ্যে বাবুর হাত আছে, নইলে কি এত বেশী দেয়। আমার কথা ঠিক কি না বাবুকে জিজ্ঞাসা করুন না মা।

আমি বললাম, জিজ্ঞাসা করতে হবে না। মীরা প্রেসের ম্যানেজার তারকবাবুর সঙ্গে আজ সকালে দেখা হয়েছিল। তিনি তোমার কাজের খুব প্রশংসা ক'রে আমাকেই মাইনে ঠিক ক'রে দিতে বললেন। আমি কুড়ি টাকা বল্‌তে, তারকবাবু বল্‌লেন, না, না, অমন কাজের লোককে অত কম দেওয়া ঠিক নয়। ওকে আপাততঃ চব্বিশ দিই। তিন মাস পরে ত্রিশ করে দেব। আর ওভার-টাইম দিয়ে আরও কিছু পাইয়ে দেব। সুতরাং হে শ্রীমান রমেশচন্দ্র, আমি তোমাকে চার টাকা কম দেবারই প্রস্তাব ক'রে-ছিলাম; তোমার প্রণাম আমার প্রাপ্য নয়। বরঞ্চ তোমার মাকে আর একবার প্রণাম কর; কারণ, উনি তোমার প্রণাম পেলে সোনার দোয়াত-কলম হোক বলে আশীর্ব্বাদ করবেন! চব্বিশ

টাকাতে ত আর সোনার দোয়াত-কলম হয় না। ওঁকে বারবার প্রণাম কর, তা' হ'লে চাই কি দু-চার বছরের মধ্যেই তোমার সোনার দোয়াত-কলম হবে। ওঁর আশীর্ব্বাদ বড় ফলে রমেশ। এই দেখ না, ওই সোনার দোয়াত-কলম হোক্ বলে নরেশ আর পরেশকে সর্ব্বদা আশীর্ব্বাদ করতেন কি না। সেই আশীর্ব্বাদের ফলে নরেশ এম-এস্-সি পরীক্ষায় সর্ব্বপ্রথম হয়ে সরকারী হিসাব-বিভাগে এমন বড় চাকুরী পেয়েছে; তার সোনার দোয়াত হয় নি, কিন্তু সোনার কলম হয়েছে। মেজ ছেলে পরেশ যে এবার বি-এ অনারে ইংলিশে ফার্ষ্ট হয়েছে, তাও ওঁর ওই সোনার দোয়াত-কলম হোক্, এই আশীর্ব্বাদের ফল

গৃহিণী হেসে বল্লেন, সুধু সে আশীর্ব্বাদ ফল্ল না আমার দীনেশের বেলায়, কোন রকমে আই-এস-সি পার হয়েছে।

রমেশ বল্ল, দেখ্বেন বাবু, মায়ের আশীর্ব্বাদ ফলবেই, ছোট্-দা বি-এস-সিতে সবার উপরে যদি না হন, তা হলে আমি মা, আপনার ছোট ছেলেই নই। যাক্‌গে সে কথা। এই দেখুন না, এই ছয়-দিনের মাহিনের টাকা পেয়েছি। এই বলে রমেশ কয়েকটা টাকা আর গোটাকয়েক এক-আনি আমার গৃহিণীর পায়ের কাছে রেখে দিল। তিনি সবগুলি কুড়িয়ে নিয়ে রমেশের মাথায় ঠেকিয়ে, তারপর নিজের মাথায় ঠেকিয়ে রাখ্লেন।

আমার বড় ছেলে নরেশ আমার পাশেই একখানি ইজি চেয়ারে বসে ছিল। সে বল্ল, মা, রমেশ কত পেলে?

গৃহিণী বল্লেন, কত পেলে, সে হিসেব তুমি এতবড় হিসেব-নবীশ হয়ে আমাকে জিজ্ঞেস করছ!

নরেশ হেসে বল্‌ল, আমি বল্‌ব মা, এ মাস ত্রিশ দিন। তা' হ'লে চব্বিশ টাকা হিসেবে ছয় দিনের মাইনে—এই ব'লে একটু চুপ ক'রে থেকেই বল্‌ল, চার টাকা, বারো আনা, তিন পয়সা। দেখ দেখি গণে মা, ঠিক হয়েছে কি না।

গৃহিণী টাকা গণে বল্‌লেন, ঠিক হবে না কেন? এই সামান্য হিসেব, এ যে আমিও কর্‌তে পারি; তুমি ত চার-শো টাকা মাইনের অডিটর!

নরেশ বল্‌ল, বাবা, এক কাজ কর্‌তে হবে। রমেশকে মা ত পোষ্যপুত্রই নিয়েছেন, সুতরাং, ওর একটা ব্যবস্থা এখন থেকেই কর্‌তে হবে।

আমি বল্‌লাম, সে ব্যবস্থা ত তোমার মা ক'রে ফেলেছেন; আমি আর তোমরা কয়ভাই যতদিন বেঁচে থাক্‌ব ও থাক্‌বে, ততদিন রমেশ তোমাদের ছোট ভাইয়ের মতই থাক্‌বে। আর কয়েক দিন যাক্‌, দীনেশের যখন বিয়ে দেব, তখন রমেশেরও বিয়ে দিয়ে ওর বৌকে এনে এখানে রাখা যাবে।

নরেশ বল্‌ল, সে ত বেশ কথা। আর কিছু?

রমেশ বল্‌ল, আরও কিছু বলুন মা! বড় দা' চুপ কর্‌লেন যে, বলুন, রমেশকে বর্দ্ধমানের রাজার জমিদারী কিনে দেবেন। আচ্ছা মানুষ ত আপনারা! কোথাকার কে এক পিতৃহীন মাহিষ্যের ছেলে, তাকে নিয়ে এত করা কেন? চব্বিশ টাকা মাইনের কম্পোজিটর যে আমি, সে কথা আপনারা ভুলে যাচ্ছেন। কেমন মা, ঠিক কথা নয়।

নরেশ হেসে বল্‌ল, তুমি এই রঙ্গমঞ্চ থেকে প্রস্থান কর ত রমেশ। যাও হাত-মুখ ধুয়ে কিছু জল খাও গে।

গৃহিণী বল্‌লেন, দেখেছ, সে কথা ভুলেই গিয়েছি। ও যে ছ'টার পরেই এসে যা হয় খায়, আজ সাতটা বেজে গেল, তবুও ওকে না দেখার ভাবনায় ও-কথাটা মনেই আসে নি।

রমেশ বল্‌ল, মা, আমি ইচ্ছে করে দেরী করি নি। ছুটি হবার একটু আগেই ম্যানেজারবাবু বলে পাঠালেন, তাঁর সঙ্গে দেখা না ক'রে যেন আমি চলে না আসি! অন্য কম্পোজিটারের মুখে শুনলুম, আজ তারা হপ্তা পাবে; তাদেরও বাসায় যেতে দেরী হবে। তারা না হয় হপ্তা পাবে, আমি ত পাব না, এখনও চাকুরীই হয় নি। তা' কি কর্‌ব ম্যানেজারবাবুর হুকুম, থাক্‌তে হলো। ছ'টার পর সকলের হপ্তা দেওয়া শেষ হয়ে গেলে ম্যানেজার-বাবু আমাকে ডেকে বল্‌লেন যে, তিনি আমাকে চব্বিশ টাকা ক'রে মাইনে দেবেন। তার পরই এই হপ্তার মাইনে আমাকে দিলেন। তাঁকে প্রণাম ক'রে আমি ছুটে এসেছি; পথে একটুও দেরী করি নি মা। প্রেসেই যে দেরী হয়ে গেল, তার আর কি কর্‌ব, কেমন মা?

গৃহিণী বল্‌লেন, সে ত ঠিক কথা। এখন হাত-মুখ ধুয়ে এসে কিছু খাও।

নরেশ বল্‌ল, দেখ মা, এই ছেলেটা যাদুবিদ্যা জানে। তোমাদের ত যাদু করেছেই এই সাত-আটদিনের মধ্যে। আমি যে এমন জানোয়ার, আমাকেও রমেশ বশ করে ফেলেছে। এই কয়দিনে দেখছি, বাড়ীশুদ্ধ সবার মুখেই রমেশ! যাক গে সে কথা। আমি বল্‌ছিলাম কি বাবা, এক কাজ করা যাক্‌। রমেশ যা' মাইনে পাবে, সে টাকা ও মাসে মাসে ওর মাকে পাঠিয়ে দেবে; এখানকার ওর সব খরচ বাবা, আপনি চালাবেন। আমি কি

বল্‌তে চাই জানেন। ওদের প্রেসে ত প্রভিডেণ্ট ফণ্ড নেই। আমি ওর জন্য প্রভিডেণ্ট ফণ্ড কর্‌ব। ও মাসে যে টাকা মাইনে পাবে, আমি ঠিক সেই পরিমাণ টাকা আপাততঃ পোষ্ট অফিসের সেভিং ব্যাঙ্কে ওর নামে রেখে দেব। একটু বেশী জমা হ'লেই ইম্পিরিয়ালে একটা একাউণ্ট খুলে দেব, কি বলেন বাবা।

আমি বল্‌লাম, অতি সুন্দর প্রস্তাব!

রমেশ লাফিয়ে উঠে বল্‌ল, অর্থাৎ রমেশচন্দ্র আজই রাত্রির গাড়ীতে দেশে চল্লেন। গরীবের ভাগ্যে এত সইবে না মা, সইবে না। এই ব'লে রমেশ ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

তিন

রমেশ ঘর থেকে বেরিয়ে গেলে আমরা তার কথাই আলোচনা করছিলাম।

আমার বড় ছেলে নরেশ বল্‌ল, দেখলে মা, কি ছেলে! কেমন আত্মসম্মান-জ্ঞান! খুব শিক্ষিত ছেলের মধ্যেও এমন দেখতে পাওয়া যায় না।

গৃহিণী বল্‌লেন, ও শিক্ষা তোমাদের স্কুল-কলেজে পাওয়া যায় না নরেশ; ও শিক্ষা বাপ-মা ভাই-বোন্‌দের কাছ থেকে হয়, বই পড়ে হয় না।

নরেশ বল্‌ল, তুমি অতি সত্যি কথা বলেছ মা। এই ভাব না, আমাদের কথা। তোমার মত মা আর ওঁর মত বাবা যদি আমরা না পেতাম, তা' হ'লে হাজার লেখাপড়া শিখে, দশটা পাশ করেও আমরা কি তোমাদের ছেলে ব'লে পরিচয় দেবার যোগ্য হ'তে পারতাম।

আমি বল্‌লাম, বাপ-মায়ের কাছে যে শিক্ষা পাওয়া যায়, তাতে যে ছেলেমেয়েদের চরিত্র গঠন হয়, এ কথা আমি অস্বীকার করছি নে। কিন্তু কি জান নরেশ, এ সব বিষয়ে আমি একটু অদৃষ্টবাদী; অথবা সোজা কথাতেই বলি, আমি একটু সেকেলে ধরণের মানুষ; আমার শিক্ষা-দীক্ষাও সেকেলে। কাজেই আমার মনে হয়, শুধু মনে হয়

কেন, আমার দৃঢ় বিশ্বাস, মানুষের প্রাক্তন-সংস্কার এতে কাজ করে। তোমরা হয় ত কথাটা মান্‌তে চাইবে না; তোমাদের বিজ্ঞান এ কথায় সায় দেবে না; কিন্তু আমি এ ছাড়া অন্য কোন কারণ ত দেখ্‌তে পাই নে। এমনও দেখেছি, অতি সাধু-সচ্চরিত্র পিতা মাতার ছেলেও ওই-এক-রকম হয়ে যায়। মা-বাপ কি তাদের উপদেশ দিতে ত্রুটী করেন, বা তাদের বাপ-মায়ের সদাচরণ, ধর্ম্মনিষ্ঠা, মহানুভবতার আদর্শ কি সে সব ছেলেদের সম্মুখে থাকে না? তবুও সে সব ছেলে বিগড়ে যায় কেন? আমি এ কথার একই উত্তর দেব —প্রাক্তন-সংস্কার। এই ধর না, রমেশেরই কথা। তার বাপ মা নিশ্চয়ই উচ্চ-শিক্ষিত নন; তাঁদের আদর্শও যে উন্নত ছিল, তাও বোধ হয় না। তাঁদের ঔরসে এমন কর্ত্তব্যনিষ্ঠ, এমন আত্মপ্রতিষ্ঠ ছেলে জন্মগ্রহণ কর্‌ল কেন?

আমার মেজ ছেলে পরেশ বল্‌ল, বাবা, এর কারণ নির্দ্দেশ করা যায় না। একে আমি pure accident বলি।

গৃহিণী বল্‌লেন, এইবার তোমাদের তর্ক আরম্ভ হোলো। এর পর যে সব কথা হবে, আমি তার মধ্যে প্রবেশলাভও কর্‌তে পার্‌ব না; সুতরাং, আমি এখন যাই, রমেশের জলখাবার নিয়ে আসি। তোমাদেরও তর্ক কর্‌তে কর্‌তে গলা শুকিয়ে যাবে, তোমাদের জন্যও চা ঠিক কর্‌তে বলে আসি। এই ব'লে গৃহিণী উঠে দাঁড়ালেন।

নরেশ বল্‌ল, মা, তুমি মনে কর, আমি ভারী তার্কিক। আসলে কিন্তু, তা' নয়। অমনি ক'রে একটা একটা কূট না চালালে বাবার কাছ থেকে কি কিছু আদায় করা যায়; উনি কি সহজে কিছু

বলেন। আমি তর্ক আরম্ভ করি, যা' তা' বলি, আর বাবা তখন তাঁর অসীম জ্ঞানের ভাণ্ডার খুলে দেন।

গৃহিণী বল্লেন, বেশ, তোম্‌রা ওঁর ভাণ্ডার লুণ্ঠন কর, আমি আস্‌ছি। দেখো, ভাণ্ডার শূন্য করে ফেলো না।

নরেশ বল্‌ল, সে ভয় নেই মা!

গৃহিণী চ'লে গেলেন; এদিকে আমরা জন্মান্তরবাদ নিয়ে ঘোর আলোচনা আরম্ভ কর্‌লাম।

আমরা আলোচনায় এমন তন্ময় হয়ে গিয়েছিলাম যে, রমেশ কখন এসে এক পাশে বসেছে, তা' আমরা জান্‌তেও পারি নি।

একটু পরে গৃহিণী খাবারের রেকাব ও জল নিয়ে যখন ঘরে প্রবেশ করলেন, তখন তাঁর দিকে দৃষ্টি পড়্‌তেই দেখি, রমেশ চুপ ক'রে ব'সে আছে।

গৃহিণী বল্লেন, তোমাদের তর্ক চলুক; আমি ততক্ষণ রমেশের ক্ষুধা নিবৃত্তি করাই।

রমেশ বল্‌ল, মা, এখন খাবার থাক্, আগে ওঁদের তর্ক শেষ হোক।

গৃহিণী হেসে বল্লেন, তর্কের কি ওঁদের শেষ আছে। তর্ক যখন আরম্ভ হয়েছে, তখন ওঁদের ঐ জন্মান্তরবাদ জন্মান্তর পর্য্যন্ত চল্‌বে। ওর জন্য ব্যস্ত হোয়ো না।

সুতরাং আমাদের তর্ক মাঝপথেই থেমে গেল। নরেশ বল্‌ল, বাবা, কাল লাইব্রেরী থেকে খানকয়েক বই না আন্‌লে আপনার কথার জবাব দিতে পারছি নে।

পরেশ বল্‌ল, বইগুলোর নাম বল না দাদা। তুমি হয় ত মনে

করেছ বাবা সে সব বই দেখেন নি। ও কথাও ভেবো না। বাবার কাছে কোন বইয়ের নাম করলে উনি অমনি বলে বসেন, ও, সেই বইখানি আমি দেখেছি। উনি যে একখানি এন্‌সাইক্লোপিডিয়া তা' বুঝি তুমি এখনও জান্‌তে পার নি।

আমি হেসে বল্‌লাম, পিতৃভক্তিরও একটা সীমা আছে পরেশচন্দ্র! কি বল হে রমেশ?

রমেশ বল্‌ল, কি জানি, অত কথা বুঝি নে। তবে, বল্‌তে পারি, পিতৃভক্তির সীমা থাকতে পারে, কিন্তু মাতৃভক্তির সীমা নেই, শেষ নেই। কেমন মা, আপনি এ কথা স্বীকার করেন কি না?

গৃহিণী বল্‌লেন, মাতৃভক্তি নয় রমেশ, মাতৃস্নেহ—তার কোন সীমা নেই। অতএব, মাতৃস্নেহের প্রমাণস্বরূপ আমি যে তোমার জন্য খাবার এনেছি, লক্ষ্মী ছেলের মত তার সদ্ব্যবহার কর। ওঁদের তর্ক আজ আর হবে না, নরেশ নজীর না এনে ছাড়বে না।

রমেশ বল্‌ল, আচ্ছা বড়দা' আপনাকেই মধ্যস্থ মান্‌ছি, মা যে আমার জন্য এই খাবার নিয়ে এসেছেন, এটা কি তাঁর স্নেহের বাড়াবাড়ি নয়। আপনিই এর বিচার করুন।

নরেশ বল্‌ল, বাড়াবাড়িটা কি দেখলে তুমি। বিকেলে কাজ-কর্ম্ম সেরে বাড়ী এলে সকলেরই ক্ষিদে পায় এবং তখন জলযোগ করতে হয়। এর মধ্যে স্নেহের আধিক্য কি দেখলে তুমি?

রমেশ বল্‌ল, বড়-দা, মা স্নেহে অন্ধ হয়ে ভুলে গিয়েছেন যে, আমি অতি গরীব চাষার ছেলে। আমরা এ সব খাবারের মুখও কখন দেখতে পাই নে, খাওয়া ত দূরের কথা। আমাদের ক্ষিদে লাগলে আমরা মুড়িগুড় খাই, তাও যদি ঘরে থাকে; নইলে না

খেয়েই থাকি। মা সে কথা ভুলে গিয়েছেন। তিনি ঠিক ভেবেছেন আমি অবসরপ্রাপ্ত সদর-আলা শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ সিংহ, এম-এ, বি-এল্ মহাশয়ের ছেলে। কেমন মা; ঠিক কথা বলি নি।

গৃহিণী বল্‌লেন, অতি ঠিক কথা বলেছ; আমি তাই-ই মনে করি। তোমাকে আমি ত কতদিন বলেছি, আমার নরেশ, পরেশ, দীনেশ, আর রমেশ—আমার এই চার ছেলে।

রমেশ বল্‌ল, মা, এ ভুল যে ভাঙ্গতে হবে। আমাকে বাবু ক'রে তুলবেন না। আমার মনে পড়ে, বাবা যখন বেঁচে ছিলেন, তখন একদিন আমি তাঁর কাছে একটা ছাতা চেয়েছিলাম। বাবা তাতে বলেছিলেন, যাকে দু'দিন পরে দুপুর রৌদ্রে মাঠে গিয়ে চাষ করতে হবে, তার ছাতা মাথায় দেবার বদ্-অভ্যাস করতে নেই। বাবা আরও বলেছিলেন, রমেশ, একটা কথা মনে রেখো, কখনও দরকার বাড়িয়ো না। চাষার ছেলে, চাষার মতই থেকো, কোনদিন কোন কষ্ট হবে না। মা, আমি বাবার সে কথা ভুলি নি, কোনদিন ভুলব না।

আমি আর চুপ ক'রে থাকতে পারলাম না। এমন সুন্দর কথা একটী নবীন যুবকের মুখে আমি কমই শুনেছি। আমি নরেশকে বল্‌লাম, নরেশ, আমি একটু আগেই তোমাকে যে বলেছিলাম, রমেশের বাপ-মা নিশ্চয়ই উচ্চ-শিক্ষিত নন, তাঁদের আদর্শও উন্নত ছিল না, আমি আমার সে কথা ফিরিয়ে নিচ্ছি। আমি রমেশের পরলোকগত পিতার উপর অবিচার করেছিলাম; সে জন্য অপরাধ স্বীকার করছি। শুন্‌লে ত, রমেশের পিতা রমেশকে কি উপদেশ দিয়েছিলেন; আর রমেশ সে পিতৃবাক্য ভোলে নাই, জীবনে ভুল্‌বে না। তোমাদের

উচ্চ-শিক্ষিত বাবার চাইতে রমেশের এই অশিক্ষিত বাবা যে কত উন্নত, তা' আমি বেশ বুঝতে পার্‌ছি। এমন উন্নতমনা বাপের ঔরসে এমন ছেলেই জন্মগ্রহণ করে। তাঁর আদর্শের কাছে আমাদের আদর্শ কি ক্ষুদ্র, কি সঙ্কীর্ণ!

রমেশ তাড়াতাড়ি উঠে এসে আমার পায়ের ধূলা নিয়ে বল্‌লে, অমন কথাও বল্‌বেন না। ওতে অপরাধ হয়। আপনার সঙ্গে আমার বাবার তুলনা! আপনি যে হিমালয় পর্ব্বত!

আমি তখন রমেশকে আমার বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরে বল্‌লাম, তোমার মত পুত্রলাভ বহু সাধনার ফল বাবা!

চার

দিন তিনেক পরে একদিন বিকালে আমি উপরের ঘরে ব'সে একখানি বই পড়ছি। বেলা তখন প্রায় ছ'টা। সেই সময় রমেশ তাড়াতাড়ি সেই ঘরে এসে বল্‌ল, মা কই?

আমি বল্‌লাম, আজ যে ছ'টার আগেই এসেছ, আর এসেই অমনি মায়ের খোঁজ কর্‌ছ। কোন নতুন সংবাদ আছে নাকি? প্রেসে বুঝি এখন কাজ কম, তাই সকাল সকালই ছুটী পেয়েছ।

রমেশ হেসে বল্‌ল, কাজ কম ত নয়ই, খুব বেশী। আজ আমাকে তিন ঘণ্টা ওভার-টাইম কাজ কর্‌তে হবে। সেই কথা বল্‌বার জন্য পনর মিনিটের ছুটী নিয়ে এসেছি। আমাকে এখনই যেতে হবে।

রমেশের গলার আওয়াজ পেয়ে গৃহিণী সেখানে এসে পড়্‌লেন। রমেশের শেষ কথাটা তিনি বাইরে থেকেই শুন্‌তে পেয়েছিলেন। ঘরের মধ্যে এসেই বল্‌লেন, আবার এখনই যেতে হবে বাবা!

রমেশ বল্‌ল, আজ তিন ঘণ্টা ওভার-টাইম কাজ কর্‌তে হবে। ফিরে আস্‌তে সেই রাত সাড়ে ন'টা। আমি পনের মিনিটের ছুটী নিয়ে সেই কথা বল্‌বার জন্য এসেছি মা, নইলে আপনি যে মানুষ, একটু দেরী হলেই রমেশের কি হলো ব'লে সারা বাড়ী মাথায় ক'রে বস্‌বেন। আমি ব'লে এসেছি, এই যে পনের মিনিট ছুটী নিলাম,

সওয়া ন'টা পর্য্যন্ত কাজ করে সেটা ঠিক করে দেবো। তাতেই ত বলছিলাম আমার বাড়ী ফিরতে রাত সাড়ে ন'টা হবে।

আমি বললাম, অত রাত্রে একলা আসতে ভয় করবে না ত? তা, কেষ্টাকে ন'টার সময় প্রেসে পাঠিয়ে দেব; সে তোমাকে সঙ্গে করে নিয়ে আসবে।

আমার কথা শুনে রমেশ হো হো ক'রে হেসে উঠল। আপনি কি যে বলেন বাবু! রাত ন'টায় এইটুকু পথ আসতেই ভয় করবে? এর চাইতেও বেশী রাতে কত দিন মেদিনীপুর থেকে বাড়ী গিয়েছি। বড় বড় মাঠ, জঙ্গল, এক-পেয়ে পথ, সাপ-বাঘের আড্ডা। তা'তেও আমার ভয় হয় নি; আর কলকাতার এই পথে আসতে আমার ভয় হবে? জানেন মা, পাড়া গাঁয়ে আমাদের বাড়ী। আপনারা ত পাড়াগাঁ দেখেন নাই, বুঝতে পারবেন না। আমাদের ভয়-ডর নেই।

আমি বললাম, রমেশ, তুমি সবে কলকাতায় এসেছ। এ যে কি ভয়ানক স্থান, তা' তুমি জান না। এখানে প্রতি পদে বিপদের আশঙ্কা। দিনে দুপুরেও এখানে সাবধানে চলতে হয়।

রমেশ বলল, তা' ব'লে প্রেসের সামান্য কম্পোজিটারকে ন'টার সময় বাড়ী আনবার জন্য চাকর পাঠাতে হবে, এমন হাসির কথা যে আপনি কেমন ক'রে বললেন, তা' আমি ভেবে পাচ্ছি নে। যাক্ গে সে কথা। আমি আর দেরী করতে পারছি নে মা! এই দেখুন, ঘড়িতে ছ'টা বাজতে পাঁচ মিনিট বাকী। আমি খুব জোরে হেঁটে গেলে ঠিক ছ'টায় প্রেসে পৌঁছতে পারব।

তার কথা শুনে গৃহিনী বললেন, তাই ব'লে জল না খেয়েই যাবে? সে কি কথা। তুমি এক মিনিট অপেক্ষা কর, আমি খাবার নিয়ে

আস্ছি। সেই ন'টার আগে যা'-তা' দিয়ে ছুটো ভাত খেয়ে গিয়েছ, আর ফির্বে রাত সাড়ে ন'টায়, ক্ষিদেয় যে মারা যাবে রমেশ।

রমেশ তখন ছুয়ারের কাছে গিয়েছে; ফিরে দাঁড়িয়ে বল্ল, এতদিন কোথায় ছিলেন আমার দয়াময়ী মা! না, না, আপনার জ্বালায় আমাকে দেখ্ছি কোলকাতা ছেড়ে পালাতে হবে। খাবার এখন নয় মা, ব'লে এসেছি পনের মিনিট হবে। তার বেশী দেরী হ'লে তাঁরা কি মনে কর্বেন; আমারও যে লজ্জা বোধ হবে।

এই বলেই রমেশ তাড়াতাড়ি চলে' গেল। গৃহিণী বারবার ডাক্তে লাগ্লেন, সে ফিরেও চাইল না।

আমি তখন গৃহিণীকে বল্লাম, দেখ্লে কেমন ছেলে! এমন কর্ত্তব্যনিষ্ঠা আমি ত কখন দেখি নি। ছু'মিনিট বিলম্ব কর্লে যে তার কথার অন্যথা হবে, এ লজ্জা ওই ছেলে সইতে রাজী নয়। এমন কর্ত্তব্যপরায়ণতা ছুর্লভ। ছেলেটী সত্য-সত্যই রত্ন। ভগবান ওর মঙ্গল কর্বেন। ওর ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল, এ কথা আমি দৃঢ়তার সঙ্গে বল্তে পারি।

গৃহিণী বল্লেন, আমি ওকে প্রথম দিন দেখেই চিন্তে পেরে-ছিলাম এমন ছেলে হয় না। আহা, সেই রাত সাড়ে ন'টায় আস্বে, ক্ষিদেয় বড়ই কষ্ট পাবে।

আমি বল্লাম, কেষ্টাকে দিয়ে প্রেসে কিছু খাবার পাঠিয়ে দিলে হয় না?

গৃহিণী বল্লেন, তা' হ'লে আর রক্ষা থাক্বে না, বাড়ী এসে তুমুল কাণ্ড কর্বে।

আমি বল্লাম, সে কথা ঠিক।

আমাদের বাড়ীর ব্যবস্থা এই যে, ন'টার মধ্যে সকলের আহার শেষ করতে হবে। বামুনটা ন'টা বাজলেই বাসায় চলে যায়। সেই জন্য আটটার সময়ই আমরা আহার শেষ করি। কোন কারণে ছেলেদের বাড়ী ফিরতে বিলম্ব হ'লে তাদের রাত্রির খাবার গৃহিণীর ঘরে পৌঁছে দিয়ে বামুন চলে' যায়। তা' ব'লে আমরা যে নয়টার সময়ই শুয়ে পড়ি, তা' নয়। ছেলেরা দশটা-এগারটা পর্য্যন্ত পড়াশুনা ক'রে, আমার কাছে বসে গল্পগুজব করে, কখনও বা তর্ক জুড়ে দেয়; গৃহিণীও এটা-ওটা করে রাত এগারটা বাজান। সুতরাং রমেশের রাত সাড়ে ন'টায় বাড়ী ফিরে আসায় যে আমাদের কারও কষ্ট বা অসুবিধা হবে, তা' নয়।

আমরা সেদিনও সকলে আহারাদি শেষ ক'রে গল্প আরম্ভ করেছিলাম; গৃহিণী কিন্তু অভুক্ত রইলেন। নরেশ সেই কথা বলতে, তিনি বললেন, যেদিন তোমরা বিলম্ব ক'রে বাড়ী এস, সেদিনও তোমাদের যেমন খাওয়া শেষ না হ'লে আমি খেতে পারি নে, আজও রমেশ এসে না খেলে আমি কিছুই খাব না।

তাঁর কথা শেষ না হ'তেই রমেশ ঘরের মধ্যে প্রবেশ করে বলল, শুনতে পেয়েছি মা, আপনি আমার জন্য অনাহারে বসে' আছেন। সেই জন্যই ত বলেছিলাম, আমি মেসে যাই। তা' ত আপনারা শুনলেন না। এই দেখুন ত, সবারই খাওয়া হয়ে গিয়েছে, আর আপনি আমার খাবার আগলে বসে' আছেন।

গৃহিণী বললেন, তা'তে কি হয়েছে। রাত বারোটাও বাজে নি, একটাও বাজেনি যে, ঘুমে চোখ বুজে আসছে। চল বাবা, তোমাকে খেতে দিই গে।

রমেশ বল্‌ল, মা, আমার যে খাওয়া হয়ে গিয়েছে। কোল-কাতার ছাপাখানার ব্যবস্থার কথা কি আমি জানি! আমাদের প্রেসের নিয়ম এই যে, ছ'টার পর তিন ঘণ্টা কাজ করলেই এক রোজের মাইনে অতিরিক্ত পাওয়া যায়। আর তা' ছাড়া যারা ওভার-টাইম কাজ করে, প্রেস থেকে তাদের প্রত্যেককে দু' আনা ক'রে জলপানি দেয়। সেই দু' আনা পাওনা থেকে কেটে নেয় না। এ কি আমি জানি। তা' হ'লে ত ব'লেই যেতাম যে, রাত্রে আমাকে খেতে হবে না।

গৃহিণী বল্‌লেন, জলপানি ত পেয়েছ মোটে দু' আনা। তা' দিয়ে এমন কি খাওয়া যায় যে, তা'তে পেট ভরে যায়।

রমেশ হাস্‌তে হাস্‌তে বল্‌ল, যারা নবাবী ক'রে কচুরী জিলেপী রসগোল্লা খায়, তাদের কি আর পেট ভরে। আমি ত তা' খাই নি; আমার পেটও ভরেছে, আরও চার পয়সা বাঁচিয়েছি। এই নিন্ মা, সেই চার পয়সা।

এই ব'লে রমেশ চারটি পয়সা আমার স্ত্রীর পায়ের কাছে রেখে দিল।

আমি অবাক্ হয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, কি রকম! পেয়েছ ত দু' আনা। তার এক আনা বাঁচিয়ে এনেছ; বাকী এক আনায় এমন কি খেলে, যাতে পেট ভরে গেল।

রমেশ বল্‌ল, শুন্‌বেন কি খেয়েছি। এই দুই পয়সার মুড়ি, আর দু' পয়সার বেগুনি-ফুলুরি। মা, আপনি শুন্‌লে বিশ্বাস করবেন না, দু' পয়সার বেগুনি ফুলুরি এত দিয়েছিল যে, আমি খেয়ে শেষ করতে পারি নে। এর পর যখন জলপানি পাব, তখন এক পয়সার

বেগুনি কিন্‌ব, তা' হ'লেই খুব খাওয়া হবে। আর দেখুন মা, দু' পয়সার মুড়িও বড় কম নয়। এতেও পেট ভর্‌বে না?

গৃহিণী বল্‌লেন, দেখ বাবা রমেশ, ও সব তুমি খেও না। বিদেশ যায়গা, অসুখ করলে মহা বিপদ হবে। দোকানের বেগুনি কি খেতে আছে? ও একেবারে সাক্ষাৎ বিষ যে! ওগুলো সব তেলে-ভাজা। সে তেলই কি ভাল? না, না, তোমাকে আমি মাথার দিব্যি দিয়ে বল্‌ছি, কখনও ও-সব খেয়ো না। তোমাকে জলপানি থেকে একটা পয়সাও বাঁচাতে হবে না, বরঞ্চ যেদিন তোমাকে রাতে ন'টা-দশটা অবধি কাজ কর্‌তে হবে, সেদিন ত আর বাড়ী এসে খেয়ে যেতে পার্‌বে না, সেদিন তুমি ছ'টার সময় চার আনার ভাল খাবার কিনে খেও। কাল থেকে প্রেসে যাবার সময় তোমার পকেটে আমি কিছু পয়সা রেখে দেব। কোন্ দিন যে তোমায় অতিরিক্ত কাজ কর্‌তে হবে, তা' ত আর জান্‌তে পারা যাবে না, তাই সঙ্গে পয়সা রেখো। বল, আমার সুমুখে যে, আর কখনও বেগুনি খাবে না। যে অত্যাচার আজ করেছ, আজ তুমি খেতে চাইলেও আমি কিছু খেতে দেব না।

তারপর আমার দিকে চেয়ে বল্‌লেন, ও গো, তুমি রমেশকে একটা হোমিওপ্যাথি ওষুধ দাও, ওর যাতে ওই সব অখাদ্য জীর্ণ হয়ে যায়।

রমেশ আর হাস্য সংবরণ করতে পার্‌ল না, বল্‌ল, আচ্ছা যায়গায় এসে পড়েছি। মা, আপনারা কি আমাকে বাবু না বানিয়ে ছাড়বেন না। মুড়ি বেগুনি খেলে যে মানুষ মরে যায়, এ কথা আমার আত্মীয়-স্বজন শুন্‌লে আপনাদের পাগল বল্‌বে। ওই যে আমাদের

প্রধান জলখাবার। ওর চাইতে ভাল খাবার আমরা জানি নে; ঐ খেয়েই আমরা এত বড় হয়েছি।

আমি বল্‌লাম, মুড়িতে আপত্তি নেই, কিন্তু বেগুনিগুলো খাওয়া ঠিক নয় রমেশ।

রমেশ বল্‌ল, বেশ, বেগুনি আর খাব না। তার চাইতে মায়ের আদেশ শিরোধার্য্য ক'রে শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র দাস মহাশয় কাল থেকে রসগোল্লা খাবেন। কেমন মা, আপনি খুসি ত! দেখুন, বড়-দা', আমি মেদিনীপুরে একবার এক থিয়েটার দেখেছিলাম। তার সব কথা ভাল মনে নাই। এইটা মনে আছে, কে না কি একদিনের জন্য বাদশা হয়েছিল।

নরেশ বল্‌ল, তুমি আবুহোসেনের কথা বল্‌ছ?

রমেশ বল্‌ল, হ্যাঁ হ্যাঁ, বড়-দা', আবুহোসেন, আবুহোসেন। আমিও দেখছি তাই হ'য়ে পড়লাম। যাক্ গে, আর রাত ক'রে কাজ নেই; আমি শুয়ে শুয়ে আবুহোসেন হই গে।

এই ব'লে রমেশ নীচে চলে' গেল। আমরা ছেলেটার কথা শুনে সত্য-সত্যই অবাক্ হয়ে গেলাম।

পাঁচ

রমেশ চলে' গেলে গৃহিণী বল্‌লেন—আর রাত ক'রে কি হবে; আমি কাজকর্ম্ম সেরে আসি। এই বলে' তিনি চলে' গেলেন। ঘরের মধ্যে আমি আর নরেশ রইলাম।

নরেশ বল্‌ল—বাবা, এবার পূজার সময় আমরা কোথাও বেড়াতে যাব না। আপনি গেল দু'বছর কোনখানে যাননি। আমি বলি কি, মাকে নিয়ে আপনি এবার বেড়িয়ে আসুন। সঙ্গে নিয়ে যান দীনেশকে আর রমেশকে।

আমি বল্‌লাম, এবার একটু বেড়িয়ে আসবার কথা আমারও মনে হয়েছে; তোমার সঙ্গে সে সম্বন্ধে পরামর্শ করব বলে'ও মনে ক'রছিলাম। তা দেখ্‌ছি, আমার মনের কথা তুমি আগে থাক্‌তেই জান্‌তে পেরেছ। কিন্তু, তোমার ছেলেমেয়ে ছেড়ে কি তোমার মা যেতে চাইবেন? তিনি হয় ত বলে' বসবেন,—ছেলেমেয়ে বৌমা সবাইকে নিয়ে যেতে হবে। আমি কি এতগুলিকে নিয়ে চল্‌তে পারব?

নরেশ বল্‌ল—না, না, অত লটবহর নিয়ে যাওয়া হবে না। সে সব আমি মাকে বলে' ঠিক করব। আপনি, মা, দীনেশ আর রমেশ; আর একটা চাকর, একজন রাঁধুনী; আর কেউ নয়। আপনাকে কোন গোলমালে থাক্‌তে হবে না; দীনেশ আর রমেশ

সব গুছিয়ে চল্‌বে। দীনেশের বয়স কম হ'লে কি হয়; সে একেবারে একস্‌পার্ট। সেবার আমাদের সঙ্গে যখন দীনেশ বোম্বাই গিয়েছিল, তখন আমাদের কিছু করতে হয় নি; সবই সে করেছিল। তারপর তার সঙ্গী হবে রমেশ—একেবারে সোনায় সোহাগা। তাই ঠিক করব; কি বলেন বাবা?

আমি বল্‌লাম, রমেশ কি ক'রে যাবে? তাদের ছাপাখানার যে দশ দিনের বেশী ছুটী নেই। আমরা যদি যাই, তা' হ'লে ফিরতে যেমন ক'রে হোক একটা মাস ত বটেই।

নরেশ বল্‌ল, তা'তে কি। প্রেসের ম্যানেজার আপনাকে যথেষ্ট খাতির করেন। তিনি কি আর রমেশকে পনের-কুড়িদিনের ছুটী দেবেন না? মাইনে দিতে না চান, বিনা মাইনেতেই ছুটী দেবেন।

আমি বল্‌লাম, তা' অবশ্য হ'তে পারে। কিন্তু, জান ত, রমেশ বিধবার একমাত্র সন্তান; ওর বড় বোনটীও নিঃসন্তান বিধবা। পূজোর সময় রমেশ বাড়ী না গেলে তাঁদের মনে যে কষ্ট হবে।

নরেশ বল্‌ল, এরই মধ্যে একটা শনিবার প্রেস কামাই ক'রে শুক্রবারে ও বাড়ী যাক্ না। সোমবার ফিরে আস্‌বে। আরও এক কাজ করা যেতে পারে। গঙ্গাস্নান করবার জন্য পূজার কিছু আগে রমেশের মাকে আর দিদিকে এখানে দিন কয়েকের জন্য আনলেই ত হয়।

আমি বল্‌লাম, রমেশ কি তা'তে সম্মত হবে?

নরেশ বল্‌ল, মা আর আপনি যদি বলেন, আর আমরা সবাই যদি 'বেশ, বেশ' ক'রে উঠি, তা হ'লে রমেশের সাধ্যও হবে না যে, সে অস্বীকার করে।

আমি হেসে বললাম, তোমার এ প্রস্তাব আমি গ্রহণ করতে প্রস্তুত আছি নরেশ।

নরেশ বল্‌ল, তা' হ'লে আর দেরী করা হবে না। বেড়াতে যাওয়ার কথাটা এখন একেবারে চাপা থাক। ওরা এলে সুবিধামত কথাটা তোলা যাবে।

রমেশ শুতে যাওয়ার পর আমাদের এই সব কথাবার্ত্তা শেষ হ'তে বোধ হয় দশ-পনের মিনিট লেগেছিল ; তার বেশী নয়। দেখি রমেশ তাড়াতাড়ি এসে উপস্থিত।

আমি বল্‌লাম, কি হে, এখনও ঘুমুতে যাও নি ?

নরেশ বল্‌ল, ওর বোধ হয় ক্ষিদে পেয়েছে ; তাই মায়ের কাছে এসেছে। কেমন, আমি ঠিক বলি নি রমেশ ?

রমেশ বল্‌ল, বড়-দা', আপনার কথার অর্দ্ধেক ঠিক্‌, আর অর্দ্ধেক ভুল। আমি মায়ের কাছে এসেছি, এটা ঠিক ; কিন্তু আমার ক্ষিদে পায় নি। একটা বিশেষ দরকার আছে।

নরেশ বল্‌ল, এই রাত প্রায় সাড়ে দশটার সময় মায়ের কাছে এমন কি দরকার, যার জন্য তুমি ঘুম কামাই ক'রে ছুটে এসেছ ?

রমেশ বল্‌ল, মা না এলে সে কথা হবে না।

গৃহিণী দুয়ারের গোড়ায় এসে ছিলেন ; এই কথা শুনে আর বিলম্ব না ক'রে ঘরের মধ্যে এসে বললেন—কি রমেশ, এত রাত্রে মায়ের খোঁজ পড়ল কেন ; ক্ষিদে পেয়েছি বুঝি ?

নরেশ বল্‌ল, আমিও সেই কথা বল্‌তেই তোমার ছেলে বল্‌লেন, ওটা মিথ্যা কথা। ওর আর একটা কি বিশেষ দরকার আছে। আমরা বাইরে যাব না কি রমেশ ?

রমেশ বল্‌ল, দেখছেন মা, দাদার সব কথাতেই তামাসা।

গৃহিণী বল্‌লেন, যাক ও সব ; তোমার কথাটা কি, বল ত ?

রমেশ বল্‌ল, আমি ত ঘরে গিয়ে শুয়েছিলামই ; কিন্তু ঘুম যে এলো না মা ! আমি ভারি একটা অন্যায় কাজ না বুঝে ক'রে ফেলিছি। আপনাদের কাছে সে কথাটা না বল্‌লে আমি রাত্রে ঘুমুতে পারব না।

নরেশ বল্‌ল, এমন কি অন্যায় কাজ তুমি ক'রে বসেছ রমেশ ? আমাদের ত দৃঢ় বিশ্বাস তোমার দ্বারা কোন অন্যায় কাজ হ'তেই পারে না।

রমেশ বল্‌ল, শুন্‌ছেন মা, বড়-দা'র কথা। উনি নিজে কখনও কোন অন্যায় কাজ করেন না, করতে পারেন না ; তাই উনি মনে করেন, সবাই ওঁরই মত শ্রীযুক্ত নরেশচন্দ্র সিংহ। কেমন মা, ঠিক বলি নি ?

নরেশ হেসে বলল, বাবা, আপনিও কোন দিন আমাকে এমন সার্টিফিকেট দেন নি। তা' যাক্, তোমার অন্যায় কার্য্যের কথাটা বলে' ফেল না ভাই ; আমি শুনে নিশ্চিন্ত মনে শুতে যাই।

রমেশ বল্‌ল, মা, এই একটু আগে প্রেস থেকে এসে আপনার কাছে যে চারটে পয়সা দিলাম, সে কাজটা কি ভাল হয়েছে ?

নরেশ বল্‌ল, কোন্ কাজটা ? মায়ের হাতে চারটী পয়সা দেওয়ায় তাঁকে তুচ্ছ করা হয়েছে, এই কি তুমি বল্‌তে চাও ?

রমেশ বল্‌ল, শুন্‌লেন মা, বড়-দাদার কথা ; উনি তামাসা ছাড়া কথা বল্‌তেই পারেন না। আমি কি তাই বল্‌ছি। মা, আপনার এই বড় ছেলেটীর বুদ্ধি বড় কম।

গৃহিণী সহাস্যমুখে বল্লেন—ঠিক বলেছ বাবা। আমার এই নরেশটার বিষয়বুদ্ধি একটুও নেই। ও যে কি করে অত বড় চাকরীটা করে, তাই আমি দিনরাত ভাবি। যাক্ গে সে কথা। এখন তুমি বল, কোন্ কাজটা ভাল হয় নি? কার পক্ষে তা' ভাল হয় নি—তোমার, না আমার।

রমেশ বল্ল, মা, আপনি কখনও কিছু অন্যায় কাজ করতে পারেন, এ কথা আমি কেন, কেউ বিশ্বাস করবে না। অন্যায় আমিই করেছি। সেই কথাই ত বলতে এত রাত্তিরে দৌড়ে এলাম। কথাটা না শুনিয়ে পারছি নে।

নরেশ বল্ল, শুনার জন্যই ত বসে আছি, তুমি যে খুলে কোন কথাই বলছ না।

রমেশ বল্ল, কথাটা কি জানেন মা, প্রেসের ম্যানেজারবাবু যে জলপানি ব'লে প্রত্যেককে দু' আনা ক'রে পয়সা দিয়েছিলেন, সে কিসের জন্যে?

গৃহিণী বল্লেন, তোমাদের জলযোগের জন্যে।

রমেশ বল্ল, এই দেখুন। জলযোগের জন্যে যে দিয়েছিলেন, তা' ত সকলেই জানে।

আমি বল্লাম, তাঁর এই দু'আনা দেওয়ার মধ্যে ত কোন অন্যায় নেই। তোমরা সেই সকালে ন'টায় কাজ করতে গিয়েছ; তোমাদের যদি রাত ন'টা পর্য্যন্ত কাজ করতে হয়, তা' হ'লে তোমরা ক্ষুধায় ক্লান্ত হয়ে পড়বে, তারই জন্য তোমাদের এই জলপানি দিয়েছেন। কেমন?

রমেশ বল্ল, সেই ত কথা! এখন আমি যদি সেই পয়সা খরচ ক'রে না খেয়ে পুঁজি করি, সেটা কি অন্যায় হয় না?

নরেশ বল্‌ল, কিছু না, কোন অন্যায় হয় না।

রমেশ বল্‌ল, না বড়-দা, আপনার কথা ঠিক হচ্চে না। বাবু যা' বল্‌লেন সেই কথাই আসল কথা। জলপানি ম্যানেজার-বাবু আমাদের উপর দয়া ক'রে দেন নি। তাঁর কাজ যাতে সমান জোরে চলে তারই জন্য দিয়েছেন। যদি পেট জ্বলে যায়, তা হ'লে কি কাজে হাত এগোয়, না মন লাগে। যে এক ষ্টিক কম্পোজ করতে ভরা-পেটে পাঁচ মিনিট লাগে, পেটের মধ্যে আগুন জ্বলে উঠ্‌লে সেই এক ষ্টিক দশ মিনিটেও নামে না। সেই কথা ভেবেই প্রেসের ম্যানেজারবাবু জলপানির ব্যবস্থা করেছেন। আমরা যদি জল না খেয়ে ক্লান্ত শরীরে ওভার-টাইম্‌ খাটি, তা' হ'লে সেই তিন ঘণ্টায় যা' কাজ করব, অন্য সময় তা দেড় ঘণ্টায় না হোক দু' ঘণ্টায় করতে পারি। কেমন মা, এ কথা ঠিক নয়?

গৃহিণী বল্‌লেন, তুমি ত তা' কর নি রমেশ। তুমি ত সে দু' আনাই পকেটে ফেলে ক্ষুধায় ক্লান্ত হয়ে কম কাজ কর নি। তুমি ত বল্‌লে, মুড়ি-ফুলুরী দিয়ে পেট ভরিয়েছ। তবে আর তুমি অন্যায়টা কি করলে?

রমেশ বল্‌ল, আমার যখন চার পয়সাতেই পেট ভরে' গেল, তখন অবশিষ্ট চার পয়সা তখনই ম্যানেজারবাবুকে ফেরৎ দেওয়া উচিত ছিল। তা' না ক'রে আমি সেই চারটে পয়সা পকেটে করলাম। একে চুরী না বলতে পারেন বড়-দা, কিন্তু এটা যে অন্যায়, অসঙ্গত, এ কথা আপনাকে স্বীকার করতেই হবে। বাবু, আপনিই বলুন, কাজটা অন্যায় হয়েছে কি না? আমি গরীব মানুষের ছেলে বলেই তখন চারটে পয়সার লোভ সামলাতে পারি নি। এখন ঘরে

গিয়ে শুয়ে ঐ কথাটা মনে হোলো। ছিঃ, ছিঃ! গরীব হ'লেই কি আর অন্যায়-বোধ থাক্‌বে না? এই চারটে পয়সার লোভ যে সামলাতে পারে না, তার মত অপদার্থ মানুষ কি আর আছে? এই কথাই আমাকে ব্যথা দিচ্ছিল। তাই ছুটে এলাম মায়ের কাছে। মা, আপনি বলুন—'রমেশ, তোমার এ কাজটা অন্যায় হয়েছে। এমন কাজ আর কোরো না। কালই প্রেসে গিয়ে ম্যানেজারবাবুকে চারটে পয়সা ফিরিয়ে দিয়ে তাঁর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা কোরো।' মা, আপনি এই কথা বল্‌লে এবং ভবিষ্যতের জন্য সাবধান হ'তে আশীর্ব্বাদ করলে আমার মনে আর কোন গ্লানি থাক্‌বে না।

কথা ত অনেক শুনেছি; এই সুদীর্ঘ জীবনে পড়েছিও অনেক; মিশেছিও অনেক লোকের সঙ্গে। সাধু-ধর্ম্মাত্মাও অনেক দেখেছি। কিন্তু এই আঠারো বছরের ছেলে যে সকলকে পরাজয় করল! এমন কথা ত কখন শুনি নি! কে এই রমেশ? গরীব মাহিষ্যের ঘরে, নিরক্ষর কৃষকের ঔরসে এ কে জন্মগ্রহণ করেছে? কোন্ সুকৃতির ফলে এই নবীন যুবক আমার কাছে এসে আমাকে ধন্য কর্‌ল!

আমি আর ব'সে থাকতে পারলাম না, উঠে গিয়ে রমেশকে বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধ'রে বল্‌লাম—রমেশ, আজ আমার জীবন সার্থক হোলো!

ছয়

ইহার কয়েকদিন পরে এক রবিবার বিকেলবেলায় রমেশ উপরে এসে আমাকে বল্‌ল, একটী বাবু আপনার সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন।

আমি বল্‌লাম, কে এসেছেন? তাঁর নাম জিজ্ঞাসা করেছ?

রমেশ বল্‌ল, তিনি আমার চেনা লোক; আপনিও তাঁর বাবাকে জানেন, তিনি আপনার বন্ধু।

আমি বল্‌লাম, কে বল ত?

রমেশ বল্‌ল, আমি মেদিনীপুরে যাঁর বাড়ীতে ছিলাম, যাঁর কাছ থেকে চিঠি নিয়ে এসে আপনার আশ্রয় পেয়েছি, ইনি সেই হরেন্দ্রবাবুর ছেলে।

আমি বল্‌লাম, হরেন্দ্রবাবুর কোন্ ছেলে?

রমেশ বল্‌ল, হরেন্দ্রবাবুর বড় ছেলে শ্রীপতিবাবু। উনি এখন মেদিনীপুরেই ওকালতী করেন।

আমি বল্‌লাম, শ্রীপতি এসেছে। আরে, যাও যাও, তাকে এইখানেই ডেকে নিয়ে এস। সে নীচে বসে' থাকবে কেন?

আমার কথা শুনে রমেশ তাড়াতাড়ি নীচে চলে' গেল। একটু পরেই শ্রীপতিকে নিয়ে উপরে এল।

আমি বল্‌লাম, তুমি অমন পরের মত নীচে থেকে খবর দিয়েছ কেন শ্রীপতি ? এটা যে তোমার বাড়ী, উকিল হয়ে বুঝি সে কথা ভুলে গিয়েছ।

শ্রীপতি আমার পায়ের ধূলো নিয়ে বল্‌ল, নীচে এসে রমেশের সঙ্গে কথা বল্‌ছিলাম। ও বল্‌ল, আপনাকে খবর দিয়ে আসি। আমি তাতে আপত্তি করি নি।

আমি বল্‌লাম, যাক্ গে সেই কথা। কখন এলে ? হরেন্দ্রবাবু কেমন আছেন ? বাড়ীর সব ভাল ত ? তোমার বাবার সঙ্গে অনেক দিন দেখা হয় নি। তিনি ভুলেও কখন কোলকাতায় আসেন না, দেখাও হয় না।

শ্রীপতি বল্‌ল, বাড়ীর সবাই ভালই আছেন। আমি আজই এগারটার সময় এখানে এসেছি।

আমি বল্‌লাম, এগারটায় এসেছ, এতক্ষণ কোথায় ছিলে ?

শ্রীপতি বল্‌ল, কাল প্রাতঃকালে আমার পিসেমশাই মেদিনী-পুরে গিয়েছিলেন ; আজ এসে মুক্তারামবাবুর ষ্ট্রীটে তাঁর বাড়ীতে এতক্ষণ দেরী হয়ে গেল।

আমি বল্‌লাম, ভাল কথা। এখন যে কয়দিন কোলকাতায় থাকবে, আমার এখানেই থাকতে হবে।

শ্রীপতি হেসে বল্‌ল, আমি যে কালই বাড়ী যাব। বাবা আপনার কাছে একটা নিবেদন জানাবার জন্য আমাকে পাঠিয়ে-ছেন। আস্‌ছে শনিবার আমার ছোট বোনের বিয়ে। সেই উপলক্ষে আপনাদের সকলের পদধূলি তিনি মেদিনীপুরে চান। এই আবেদন নিয়ে আমি এসেছি। অনেকদিন আপনাদের দেখা-

শোনা হয় নি। এই উপলক্ষ ক'রে সে অভিযোগটা মিটিয়ে আসুন না।

আমি হেসে বল্লাম, শ্রীপতি, তুমি যে আদালতে এরই মধ্যে বেশ পশার জমিয়েছ, তা' তোমার এই আবেদন শুনেই আমি বুঝতে পেরেছি। তাই বল, তুমি তোমার বোনের বিয়েতে আমাদের নিমন্ত্রণ করতে এসেছ; কোলকাতায় বেড়াতে এস নাই। দেখ বাবা, আমার শরীরের যে অবস্থা, তাতে এখন আর কোলকাতা ছেড়ে কোথাও যেতে সাহসে কুলায় না। তোমার বোনের বিয়ে, আমার পরম বন্ধু হরেন্দ্রবাবুর মেয়ের বিয়ে, এতে যে আমাকে সকলের আগে গিয়ে দেখা-শোনা করা অবশ্য কর্ত্তব্য, এ কথা আর তোমাকে বুঝিয়ে বলতে হবে না। কিন্তু কি করি বাবা, আমি একেবারে স্থাবর হয়ে পড়েছি। বেশ, হরেন্দ্রবাবুর নিমন্ত্রণ গ্রহণ করলাম। বিবাহের দিন ছেলেদের পাঠিয়ে দেব। তুমি হরেন্দ্রবাবুকে আমার শরীরের অবস্থা জানিয়ে আমাকে ক্ষমা করতে বোলো, বুঝেছ শ্রীপতি।

শ্রীপতি বল্ল, সবাই না গেলে বাবা বড় দুঃখিত হবেন।

আমি বল্লাম, তুমি তাঁকে ভাল ক'রে বল্লে তিনি দুঃখিত হবেন না। আসছে শনিবারে বিয়ে। বেশ দিন স্থির হয়েছে। সেদিন মুসলমানদের একটা পর্ব্ব উপলক্ষে আফিসাদি বন্ধ আছে। ছেলেদের যাওয়ার কোন অসুবিধা হবে না। রমেশ, তুমি নিশ্চয়ই যাচ্ছ, কি বল?

শ্রীপতি বল্ল, রমেশকে ত যেতেই হবে, ও যে আমাদেরই।

আমি বল্লাম, তোমাদেরই রমেশ এখন আমাদের হয়েছে।

ও রমেশ, শ্রীপতিকে একটু জল খাওয়াবে না? তোমার মাকে বলে এস।

শ্রীপতি বল্‌ল, এই তিনটের পর ভাত খেয়েছি। ট্রেন থেকে নেমেই পিসেমশায়ের সঙ্গে গিয়ে জিনিস-পত্র কিছু কিন্‌তে হয়েছিল। তাই বেলা হয়ে গিয়েছিল। এখন ত আর কিছু খেতে পারব না। এ যে আমাদের ঘরের কথা। আমাকে এখনই যেতে হবে। পিসেমশাই আমার জন্য বাসায় অপেক্ষা করছেন, আবার তাঁর সঙ্গে বাজারে যেতে হবে। আমি এখনই উঠি। আপনি সবাইকে সঙ্গে নিয়ে যাবারই ব্যবস্থা করবেন। বাবা বলেছিলেন, রমেশকে দু'-তিন-দিন আগে পাঠাতে। তা' কাজ নেই। রমেশ, তুমি সকলকে সঙ্গে নিয়ে শুক্রবার বিকেলের গাড়ীতেই যেও।

আমি বল্‌লাম, সে সব ঠিক ক'রে আমরা আগেই তোমাদের সংবাদ দেব, তার জন্য কিছু ভাবতে হবে না।

শ্রীপতি তখন আমাকে প্রণাম ক'রে রমেশের সঙ্গে নীচে চলে গেল।

গৃহিণী পাশের ঘরেই ছিলেন; সেখান থেকেই সমস্ত কথা শুনতে পেয়েছিলেন। শ্রীপতি চলে গেলে তিনি ঘরের মধ্যে এসে বল্‌লেন, তা' হলে মেদিনীপুরে বিয়ের নেমন্তন্ন রক্ষা করতে যেতে হবে?

আমি বল্‌লাম, যাওয়া ত কর্ত্তব্য। হরেন্দ্রবাবু আমার পরম বন্ধু। কিন্তু, শরীরের এ অবস্থায় আর কোথাও যাওয়া চলে না। শনিবারে রমেশের সঙ্গে ছেলেদের একজনকে পাঠিয়ে দিলেই হবে। কিছু তত্বও করতে হবে।

গৃহিণী বল্‌লেন, কাকে পাঠাবে ?

আমি বল্‌লাম, ছেলেরা এলে সে কথা ঠিক করা যাবে। তাদের মধ্যে যে যেতে চাইবে, সেই যাবে।

গৃহিণী তখন এক প্রস্তাব ক'রে বস্‌লেন। তিনি বল্‌লেন, যে যাবে, তাকে বলে' দিতে হবে, সে যেন ঐদিক দিয়ে একবার রমেশের বাড়ী হয়ে ওর মা-বোনকে দেখে আসে। আর যদি পারে, তা হলে তাঁদের একবার এখানে নিয়ে আসে।

আমি বল্‌লাম, এ কথা যদি রমেশ জান্‌তে পারে, তা' হ'লে সে মেদিনীপুরেই যাবে না।

গৃহিণী বল্‌লেন, সে কথা তাকে আগে কে জানাতে যাচ্ছে। সেখানে গিয়ে সব ঠিক ক'রে নিতে হবে, রমেশ আর তখন বাধা দিতে পারবে না।

আমি বল্‌লাম, তোমার ব্যবস্থা মত কাজ করতে পারবে একমাত্র দীনেশ। রমেশ দীনেশের উপর কথা বল্‌তে পার্‌বে না।

—কার উপর কে কথা বল্‌তে পারবে না মা ? এই বলে' রমেশ এসে উপস্থিত।

গৃহিণী বল্‌লেন, উনি বল্‌ছিলেন তোমার উপর কেউ কোন কথা বল্‌তে পারবে না। নরেশ বল, পরেশ বল, দীনেশ বল, বৌমারাও বল, এমন কি কর্ত্তা পর্য্যন্তও তোমার উপর কোন কথা বল্‌তে পার্‌বেন না। এক পারব আমি—কেমন রমেশ ?

রমেশ হেসে বল্‌লে, না, না, তা' নয়। আমার উপর সবাই কথা বল্‌তে পারবেন। আমি যে সকলের ছোট মা।

গৃহিণী বল্‌লেন, যে ছোট, সেই ত সকলের বড়।

রমেশ বল্‌ল, সে আলাদা কথা। ও সব বড় কথা আমি বুঝি নে। আমি জানি, এ বাড়ীর আমি সকলের ছোট, সবাই আমার বড়। তাঁরা যা বল্‌বেন, আমাকে তাই মাথা পেতে পালন করতে হ'বে। কেমন মা, এই কথাই ঠিক না; উল্‌টো কথা বল্‌লে চল্‌বে কেন?

আমি বল্‌লাম, সেই কথাই ঠিক। এখন আমি তোমাকে আদেশ করছি, তুমি একটু বেড়িয়ে এস। অন্য দিন ত কাজ নিয়েই কাটে। আজ রবিবার একটু বেড়ালে ভাল হয়।

রমেশ বল্‌ল, তা' ত হয়। কিন্তু, অনেক কথার যে মীমাংসা করতে হবে।

আমি বল্‌লাম, যে সব কথার মীমাংসা তোমাকে করতে হবে, তা এখন থাক, রাত্রে ব'সে করা যাবে।

রমেশ বল্‌ল, কোন কাজই কাল করব বলে' ফেলে রাখতে নেই, এ উপদেশ ত আপনার কাছেই পেয়েছি। এখন অনেক কথা বিবেচনা করতে হবে। এই ধরুন, শ্রীপতিবাবু যে মেদিনীপুরে যাবার জন্যে বলে' গেলেন, তার কি করা হবে?

আমি বল্‌লাম, কালই ত যেতে হবে না। এখন বিয়ের সাত দিন বিলম্ব আছে। ছেলেরা সবাই আসুক, তখন সকলে মিলে পরামর্শ ক'রে যার যাওয়া হয়, ঠিক করা যাবে।

রমেশ বল্‌ল, তা কেন! আপনি যা বল্‌বেন, সকলেই তা পালন করবে।

গৃহিণী বল্‌লেন, বেশ ত, উনি যা বল্‌বেন, তাই হবে। কিন্তু ওঁকেও ত একটু ভেবে-চিন্তে কর্ত্তব্য স্থির করতে হবে।

রমেশ বল্‌ল, ওর আর ভাবনা-চিন্তা কি? এখনই ঠিক করা যাক্‌ না।

আমি বল্‌লাম, তোমার যদি বিলম্ব করা না সয়, তা' হ'লে তুমিই বল না, কি করতে হবে।

রমেশ বল্‌ল, আমার মত কি শুন্‌বেন? আমি বলি, কর্ত্তার গিয়ে কাজ নেই। ওঁর শরীর ভাল নয়। সেখানে গেলে নানা অনিয়ম হবেই; তাতে ওঁর শরীর আরও কাতর হ'য়ে পড়বে। উনি থাকলেই মাকে থাকতে হবে। শনিবার ত ছুটী আছে। বড়-দা', মেজ-দা' ছোট-দা' তিনজনই চলুন। মেদিনীপুরে ত কেউই যান নি, একটা নূতন স্থান দেখা হবে। আর বড় বৌদি' মেজ বৌদি' যদি যান, তা হ'লে কি যে আনন্দ হয়, তা' আর বলতে পারি নে। আমাদের দেশ যে কেমন সুন্দর, তা' একবার দেখেই আসুন না।

গৃহিণী বললেন, আমার তাতে কোন আপত্তি নেই, যদি তুমি সকলকে তোমাদের গ্রামে নিয়ে যাও।

রমেশ হো হো হো ক'রে হেসে বল্‌ল, এইবার মা পাগলের মত কথা বলছেন। ওঁরা যাবেন আমাদের গ্রামে। এ যেন দিল্লী, লাহোর! আমাদের গাঁয়ে ভদ্রলোকের বাস নেই। আমরা সবাই চাষা। সারা গ্রাম খুঁজলে একখানা ইট কেউ বা'র করতে পারে না। আমরা, যাকে বলে কুঁড়ে-ঘর, তাতেই বাস করি। তাই কি বাড়ীতে বেশী ঘর আছে। আর সে সব ঘর দেখ্‌লে আপনারা ভয়েই সারা হয়ে যাবেন—দু'ঘণ্টা বসা ত দূরের কথা। আমরা গরীব চাষা মানুষ; আমরা যে কি ভাবে বাস করি, কি

খাই, কি পরি, কেমন ক'রে আমাদের দিন চলে, সে ধারণাই আপনাদের নেই। সেইখানে যেতে চান আপনারা—একে পাগলামী ছাড়া কি বলব। মা, আপনি কিছুই জানেন না; পাড়াগাঁ যে কেমন স্থান, তা' আপনি মোটেই জানেন না। সেখানে এঁদো পচা পুকুরের জল খেতে হয়। চার-পাঁচ ক্রোশের মধ্যে ডাক্তার মেলে না। লোকের রোগ হয়, ভোগে, তারপর মরে যায়। এই আমাদের গ্রাম। পথঘাট নেই। যেতে পারেন গরুর গাড়ীতে? সে আর পারতে হয় না। ও সব কথা ছেড়ে দিন। বুঝেছি মা, অমনি অমনি কথাটা বল্‌লেন।

গৃহিণী বল্‌লেন, না রমেশ, তুমি ঠাট্টা মনে কর' না তুমি যদি সকলকে নিয়ে যেতে স্বীকার কর, সবাই যাবে।

রমেশ বল্‌ল, আপনাদের মত আমি ত পাগল হই নি। অসম্ভব মা, একেবারে অসম্ভব। তার চাইতে বলুন সোজা ক'রে যে, কারও মেদিনীপুরে যাওয়া হবে না।

আমি বললাম, যেতে হবেই। তবে, তুমি যা বল্‌ছ, তা' হয় ত হবে না। তোমার সঙ্গে ছেলেদের দু' একজনকে পাঠাব, এই ঠিক কথা। অতএব, তোমার সমস্যার মীমাংসা হয়ে গেল; এখন তুমি অনায়াসে বেড়াতে যেতে পার; তোমার চিন্তার কোন কারণ নেই।

রমেশ বল্‌ল, আচ্ছা মা, ওই বিয়েতে আপনারা ত তত্ত্ব দেবেন?

গৃহিণী বল্‌লেন, তা দিতে হবে বই কি। ওঁর বন্ধুর মেয়ের বিয়ে, সাধ্যমত যা' হয় দিতে হবে।

রমেশ বল্‌ল, আমাকেও তা' হ'লে কিছু দিতে হবে।

গৃহিণী বল্‌লেন, দেওয়া ত উচিত। তুমি যখন সেখানে ছিলে, তাঁরা তোমার জন্য যথেষ্ট করেছেন। তখন কিছু উপহার দেওয়া উচিত। বিশেষ তুমি যখন উপার্জ্জন করছ।

রমেশ বল্‌ল, আমার এই চাকরীর টাকার একটি পয়সাও আমি খরচ করতে পারব না। সব আমাকে জমাতে হবে। বাড়ীতে সামান্য যা জমি আছে তার থেকে যা' আয় হয়, যে ধান পাওয়া যায়, তাতে দুটি বিধবার চলে যায়। আমি বাড়ীতে থাকলেও চাষবাস ক'রে সংসার চালাতে পারি। তবে যে চাকরী করতে এসেছি, সে টাকা জমাবার জন্য। এর এক পয়সাও কোন দিন খরচ করব না। সেই জন্যই ত আপনারা এত বলেন, তবুও বাড়ীতে টাকা পাঠাই নে। টাকা আমাকে জমাতেই হবে—আমার প্রতিজ্ঞা।

গৃহিণী বল্‌লেন, টাকা জমিয়ে কি করবে ?

রমেশ বল্‌ল, যে দিন মা, আপনার কাছে আমার পাঁচ শ' টাকা জমবে, সেই দিন বল্‌ব টাকা দিয়ে কি করব ; তার আগে নয় মা। এই বলেই রমেশ হঠাৎ ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

সাঁঝ

(দীনেশের কথা)

বাবা স্থির করলেন, রমেশের সঙ্গে আমাকেই যেতে হবে মেদিনীপুরে হরেন্দ্রবাবুর ছোটমেয়ের বিয়ের নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে। বড়-দা' যেতে পারবেন না, তাঁর কলকাতাতেই সে দিন কি বিশেষ দরকার আছে। মেজ-দা' ওই এক রকমের মানুষ, কোথাও তিনি যেতে চান না। বাবার শরীর ভাল নয়; তাঁর যাওয়া হ'তেই পারে না। অতএব বাবা বল্‌লেন, দীনেশ, তোমাকেই মেদিনীপুরে যেতে হচ্চে।

বাবার আদেশ অমান্য করবার যো নেই। তিনি যদি আদেশ করতেন, তা' হ'লে হাজার কাজ ফেলেও বড়-দা', মেজ-দা'কেও যেতে হ'ত।

আমি বল্‌লাম, বেশ আমিই শুক্রবারে রমেশকে সঙ্গে নিয়ে মেদিনীপুর যাব।

মা বললেন, সুধু শ্রীপতির বোনের বিয়ের নেমন্তন্ন রক্ষা করলেই হবে না; আরও একটা কাজ তোমাকে করতে হবে। আর সে কাজ তুমি ছাড়া নরেশ, কি পরেশের দ্বারা হবে না। তারই জন্য কর্ত্তা তোমাকে পাঠাচ্ছেন।

আমি বল্‌লাম, তা' হ'লে আমি যে-সে ব্যক্তি নই। তোমার তিন ছেলের মধ্যে আমিই তা হ'লে সবার চেয়ে কাজের লোক।

মা বললেন, সে কথা যে সকলেই বলে। নরেশই ত তোমাকে পাঠাতে বল্‌ল।

আমি বললাম, তা' বেশ যাব ; বিয়েতে খুব খাট্‌ব, পেট ভ'রে লুচিমণ্ডা খাব, আস্‌বার সময় তোমাদের জন্য ছাদা বেঁধে আন্‌ব। কিন্তু আর একটা কি কাজ করতে হবে তা' ত বুঝতে পারছি নে।

মা বললেন, তোমাকে ওই পথে একবার রমেশদের গ্রামে যেতে হবে, আর সে কথা আগে তাকে কিছুতেই জান্‌তে দেবে না।

আমি বল্‌লাম, সে কি ক'রে হবে ? সেখানে যাবার ব্যবস্থা তার সাহায্য না নিয়ে কি ক'রে করব। তারপর, সে যদি যেতে না চায়, তা' হলে কি হবে ? আমি ত তাদের গ্রাম কোথায় তা জানি নে।

মা বললেন, শ্রীপতিকে বল্‌লেই সে সব ঠিক্ করে দেবে। সে ত আর বেশী কথা নয়। রমেশদের গ্রাম আমলাবেড়ে ; মেদিনীপুর থেকে ছ' ক্রোশ। ভাল রাস্তা নেই, যা' আছে, তাতে গরুর গাড়ীতে যাওয়া যায় ; ঘোড়াগাড়ী সে পথে চলে না। তোমরা ত শুক্রবার রাত্রে মেদিনীপুর যাবে। শনিবার বিয়ে। তুমি শনিবার প্রাতঃকালেই শ্রীপতিকে সঙ্গে নিয়ে একখানা গরুর গাড়ী ঠিক্ কোরো। সে যেন রবিবার খুব ভোরে, চাই কি একটু রাত থাক্‌তেই হরেনবাবুর বাড়ী থেকে তোমাদের নিয়ে আমলাবেড়ে যাত্রা করে। ছ' ক্রোশ রাস্তা ঠিক বেলা ন'টা-দশটার মধ্যে পৌঁছে দেবে। আবার বিকেলবেলা রওনা হয়ে রাত আটটা-ন'টার মধ্যেই মেদিনীপুর আস্‌তে পার্‌বে। যেতে-আস্‌তে কষ্ট হবে ; বারো ক্রোশ পথ গরুর গাড়ীতে যাওয়া-আসা। পাল্কীতেও যাওয়া যায় ; কিন্তু, রমেশ তাতে আপত্তি করবে ; সে যে ছেলে, পাল্কী চড়তেই চাইবে না। কাজেই গরুর গাড়ী ছাড়া অন্য উপায় নেই।

আমি বললাম, অত হাঙ্গামা কেন ? হেঁটে গেলেই চল্‌বে। ছ'

ক্রোশ রাস্তা আমি ঠিক যেতে পারব। এই যে সেবার আমরা বারাকপুর হেঁটে গিয়েছিলাম! তেমন কষ্ট ত হয় নি। তবে আস্‌বার সময় রেলে এসেছিলাম।

মা হেসে বললেন, মেদিনীপুর থেকে আমলাবেড়ে পর্য্যন্ত তোমার জন্য বারাকপুর ট্রাঙ্করোডের মত রাস্তা ত কেউ তৈরী করে রাখে নি। রমেশের কাছে শুনেছি, মাঠের মধ্য দিয়ে অমনি কোন রকমে পায়ে-চলা পথ। সেই পথেই অতি কষ্টে গরুর গাড়ী চলে। আর এক কাজ করলে পারবে। রবিবার সেখানে গিয়ে যদি ক্লান্ত হ'য়ে পড়, তা' হ'লে সেদিন নাই বা ফিরলে। রাতটা সেখানে বিশ্রাম ক'রে, সোমবার সকালে ফিরলেই পারবে।

আমি বললাম, তার জন্য ভাবছি নে। যেতে পারব। গরুর গাড়ীতে যেতে যদি কষ্টবোধই হয়, মধ্যে মধ্যে গাড়ী থেকে নেমে হেঁটে গেলেই হবে। কিন্তু, রমেশ যদি যেতে না চায়, তা' হ'লে কি করব।

মা বললেন, জোর ক'রে নিয়ে যেতে হবে ব'লেই ত তোমাকে পাঠাচ্ছি। তোমার কথা সে ফেল্‌তে পারবে না। নিতান্তই যদি সে জেদ করে, তা' হ'লে তুমি বোলো, না গেলে তুমি আমার সঙ্গে, আমি একলাই যাব। এই ব'লে তুমি গাড়ীতে উঠে বস্‌লে রমেশ তোমার সঙ্গে না গিয়েই পারবে না।

আমি বললাম, তা' যেন হ'ল, তারপর সেখানে গিয়ে কি করতে হবে?

মা বললেন, রমেশের মা ও দিদিকে আমার নাম ক'রে বল্‌বে যে, তাঁদের কলকাতায় গঙ্গাস্নান করবার জন্য নিয়ে যেতে তোমাকে আমি পাঠিয়েছি। তাঁদের কলকাতায় আস্‌তেই হবে। তাতে

তাঁরা যদি আস্‌তে না চান, তা' হ'লে আর কি করবে, ফিরে আস্‌বে। রমেশের অবস্থা কেমন, তার মা-বোন্ কেমন, সংসার চলবার কি সংস্থান আছে, এই সকলের খোঁজ নেবার জন্যই তোমার যাওয়া। তারপর, তাঁরা যদি আস্‌তে সম্মত হন, তা' হ'লে ত কথাই নেই। আর একটা কথা জান্‌তে হবে। রমেশ সেদিন বল্‌ছিল, পাঁচশ' টাকা জমিয়ে তখন সে বল্‌বে, কি জন্য বিদেশে চাকরী ক'রে সে টাকা জমাতে চায়। তার আগে কোন কথা সে বল্‌বে না। কিসের জন্য তাকে এমন ভাবে পরের চাকরী ক'রে পাঁচশ' টাকা জমাতেই হবে, এই খবরটা নেওয়া চাই।

আমি বললাম, এ সব খবর আমি ঠিক নিয়ে আস্‌ব। আর তাঁরা যদি আস্‌তে চান, তা' হ'লে এক-আধদিন ব'সে থেকে, সেখানে যদি পাল্কী না পাওয়া যায়, তা' হ'লে মেদিনীপুরে লোক পাঠিয়ে পাল্কী নিয়ে গিয়ে তাঁদের আন্‌তে হবে; গরুর গাড়ীতে তাঁদের আনা হবে না।

মা বললেন, সে ত ঠিক্ কথা। তার ব্যবস্থা তোমার বিবেচনা মত কোরো। কাল মঙ্গলবার; কাল-পরশুর মধ্যেই বিয়ের তত্ত্ব, আর রমেশের বাড়ীর জন্য কিছু জিনিষ-পত্র, তার মা আর বোনের জন্য কয়েক জোড়া কাপড় আমি গুছিয়ে রাখব। রমেশকে কোন কিছু দেখাবও না, জান্‌তেও দেব না।

আমি বললাম, বাবা এ সব কথা জানেন ত?

মা বললেন, তাঁর পরামর্শ মতই ত এ সব ব্যবস্থা হচ্চে। তিনিই ত বল্‌লেন, নরেশ কি পরেশকে দিয়ে এ সব হবে না; দীনেশই পারবে। তাই তোমাকে পাঠাচ্ছি।

আট

শুক্রবারে রমেশ যখন নয়টার আগে প্রেসে বেরিয়ে যাচ্ছিল, তখন আমি বল্‌লাম, মনে আছে ত, পাঁচটায় ট্রেণ। তুমি ঠিক চারটায় বাড়ী আসবে। বাবা তোমার ম্যানেজারকে তোমার ছুটী দেবার জন্য ব'লে রেখেছেন; সেজন্য তোমাকে ভাবতে হবে না। তুমি দেরী কোরো না।

রমেশ হাসতে হাসতে চ'লে গেল। আমি তখন মায়ের কাছে গেলাম। তিনি একটা নূতন ষ্টীল ট্রাঙ্ক খুলে তার মধ্যে যে সব জিনিষ ছিল, সব মেজেয় সাজালেন। তারপর আমাকে সেগুলি দেখিয়ে দেখিয়ে বাক্সে তুল্‌তে লাগ্‌লেন; বল্‌লেন, দেখ দীনেশ, এ নূতন ট্রাঙ্কে যা' কিছু দিচ্ছি, এ সব রমেশের বাড়ীর জন্য। এর কিছু-কিঞ্চিৎ তোমাদেরও দরকারে লাগবে। এই দেখ—রমেশের মা, আর তার দিদির জন্য চারখানা ক'রে আটখানা কাপড়, তারপর এই দু'খানা গামছা, এই দু'খানা বিছানার চাদর, এই দু'টো মশারি। এ তোমাদেরও কাজে লাগ্‌বে। যদি সেখানেই রাতটা থাক্‌তে হয়, তা হ'লে মশারির দরকার হবে। তারপর দেখ, এই সব ঠোঙ্গাতে রান্নার মসলা, পানের মসলা সব রইল, বুঝলে। তার-পর, সে ত পাড়াগাঁ, তোমার চা চাই। সেই জন্য চা দিলাম, চিনি দিলাম, কন্‌ডেন্স মিল্ক দিলাম, দু' সেট চায়ের পেয়ালা দিলাম,

একটা স্পিরিট ল্যাম্প, আর এক বোতল স্পিরিটও দিলাম। একটা হ্যারিকেন লণ্ঠনও এই ট্রাঙ্কের মধ্যে দিলাম। এক বাণ্ডিল বাতি আর এক প্যাকেট দিয়াশলাইও রইল। এসব ফিরিয়ে এনো না, সবই সেখানে রেখে এসো ; ট্রাঙ্কটাও রেখে এসো। এ ট্রাঙ্ক আর তোমাকে মেদিনীপুরে খুলতে হবে না, একেবারে চাবি বন্ধ ক'রে রেখো। পথের মধ্যে রমেশকে কিছু দেখিও না। আর এই স্যুটকেসে হরেন্দ্রবাবুর মেয়েব জন্য সাড়ী, ব্লাউস, আয়না, চিরুণী, কিছু এসেন্স, সিঁদুর, ফিতে প্রভৃতি রইল। ওখানে থেকে টাকা পাঁচেকের মিষ্টি কিনে এই সবগুলি দিও। রমেশের পক্ষ থেকে এই সাড়ীখানি দিও। আর তোমাদের দু'জনের কাপড়-জামা এই সব রইল। হোল্ড অলের মধ্যে তোমাদের বিছানা মশারি সব রইল। আমলা-বেড়ে যাবার সময় ওই নূতন ট্রাঙ্কটা আর এই হোল্ড-অলটা নিয়ে যেও। রাত্রে থাকতে হ'লে বিছানার দরকার হ'তে পারে।

আমি হেসে বল্লাম, তা' হ'লে কিছু চাল-ডাল, নুন-তেল-ঘি আর বাদ রাখ্লে কেন মা ? একেবারে ঘর-গৃহস্থালীর সব ব্যবস্থা হয়ে যেত।

মা বল্লেন, নিতান্ত দরকারী, অথচ পাড়াগাঁয়ে পাওয়া যায় না, এমনি যা' কিছু তাই গুছিয়ে দিলাম ; চাল-ডাল সবখানেই মেলে। দেখ দীনেশ, আর একটা কাজ এখনই সেরে রাখ। এখনই গিয়ে দু'খানা টিকিট কিনে রাখ। কি জানি, রমেশের ছাপাখানা থেকে আসতে যদি একটু দেরীই হয়, তা' হ'লে তখন তাড়াতাড়ি করতে হবে। তার চাইতে, টিকিট কেনা থাক্লে আর কোন ভয় থাক্বে না। তাই যাও।

নয়

রমেশ ঠিক্ চারটার সময় প্রেস থেকে এলো। তাকে হাত-মুখ ধুয়ে জল খেয়ে নিতে বলে আমি চাকরকে একখানা গাড়ী আন্‌তে পাঠালাম। একটু পরেই গাড়ী এলো।

চাকরেরা যখন বড় একটা ট্রাঙ্ক, একটা স্যুটকেশ, আর একটা হোল্ড-অল গাড়ীতে তুলছিল, তখন রমেশ এসে বল্‌ল, ছোড়্-দা, এত সব গাড়ীতে তুল্‌ছেন কেন? থাক্‌বেন ত একটা দিন, তার জন্যে এত লটবহর কেন? এ দেখে মনে হচ্ছে আমরা বুঝি মাস তিনেকের জন্য দিল্লী-লাহোর যাচ্ছি।

আমি বল্‌লাম, সে পরামর্শ তোমার কাছে নিতে হবে না। যাচ্ছি এক যায়গায়, বড় সহরে; দশজন সম্ভ্রান্ত লোক আসবেন; সেখানে কি একবস্ত্রে যেতে পারা যায়। তারপর, তাঁদের বাড়ীতে আরও লোকজন নানা স্থান থেকে আস্‌বেন ত। এত লোকের বিছানা মশারি যোগান কি সহজ কথা। নিজেদের দরকারী যা' কিছু, তা' সঙ্গে নিয়ে গেলে কোন অসুবিধাই হবে না, বুঝলে পণ্ডিত। এখন গাড়ীতে ওঠো, সময় বেশী নেই।

রমেশ বল্‌ল, ও, আমি ভুলেই গিয়াছিলাম যে, আমার ছোট দাদা শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সিংহ মহাশয় মেদিনীপুর যাচ্ছেন।

আমি বল্লাম হ্যাঁ, তাই-ই। এখন বক্তৃতা বন্ধ রেখে সুশীল ও সুবোধ বালকের মত গাড়ীতে ওঠো।

রমেশ আর বাক্যব্যয় না ক'রে গাড়ীতে উঠ্ল। তারপর পথের মধ্যে বল্ল, ছোড় দা', কাল বিয়ে শেষ হয়ে গেলে রাত্রি একটার গাড়ীতেই কিন্তু আমরা ফিরে আস্ব, কেমন ?

আমি বল্লাম, এখনও হাবড়ার ব্রিজ পার হই নি, এখনই আস্বার কথা। চল ত যাই, তারপর দেখা যাবে কখন কি করি।

রমেশ আর এ কথার উত্তর দিল না। গাড়ী হাওড়া ষ্টেশনে পৌছিলে রমেশ বল্ল, দেখুন ছোড়-দা', এইটুকু পথ-এর জন্য পয়সা ক'রে গাড়ীভাড়া না করলেই হ'ত। ঘরের গাড়ীখানা যদি মেরামত হ'তে না যেত তা' হ'লে কথা ছিল না, অকারণ পয়সা খরচ আমি সহ্য করতে পারি নে।

এ পাগলের কথায় আর কি জবাব দেব।

কুলী ডেকে ট্রাঙ্ক বিছানা তার মাথায় দিয়ে প্ল্যাটফরমের দিকে যেতেই রমেশ চেঁচিয়ে উঠল, 'ও ছোড়-দা', গাড়ীতে উঠ্তে যাচ্ছেন যে, টিকিট কাট্লেন না। টিকিট না দেখালে গাড়ীতে উঠ্তে দেবে না, তা' বুঝি জানেন না ?

আমি বল্লাম, ভাল বিপদে পড়লাম তোমাকে নিয়ে রমেশচন্দ্র ! তুমি কোন চিন্তা কোরো না, টিকিট ঠিক আছে, আগেই সে কাজ শেষ ক'রে রেখেছিলাম।

আমি দু'খানি সেকেণ্ড ক্লাসের উইক-এণ্ড রিটার্ণ টিকিট কিনে-ছিলাম। কুলীরা যখন গাড়ীর দুয়ার খুলে মালপত্র তুলতে যাবে, তখন

রমেশ দৌড়ে এসে তাদের বল্‌ল, ওরে, এ গাড়ী নয়। এ যে সেকেণ্ড ক্লাস। আমরা থার্ড ক্লাসে যাব।

আমি হেসে বল্‌লাম, রেল কোম্পানী আজ একেই থার্ড ক্লাস ক'রে দিয়েছেন। তোমার কাছে বেশী মাসুল কেউ চাইবে না।

আচ্ছা মানুষকে সঙ্গী করেছি! যাক্‌, যথাসময়ে খড়্গপুরে গাড়ী বদল ক'রে মেদিনীপুরে পৌঁছলাম। ষ্টেশনে শ্রীপতিবাবু উপস্থিত ছিলেন। তাঁর সঙ্গে আমরা হরেন্দ্রবাবুর বাড়ীতে গেলাম।

দশ

খেয়ে-দেয়ে শান্ত হয়েছি ; এইবার মা, আমাদের আমলাবেড়ে ভ্রমণ-বৃত্তান্ত শোন।

আচ্ছা লোককে আমার সঙ্গে দিয়েছিলে। রমেশকে নিয়ে যে আমাকে কি বিব্রত হ'তে হয়েছিল, সে আর বল্‌বার কথা নয়। গিয়ে উঠ্‌লাম ত মেদিনীপুরে হরেন্দ্রবাবুর বাড়ীতে। হরেন্দ্রবাবু আমাকে একেলা দেখে বল্‌লেন—তাই ত দীনেশ, আমি মনে করেছিলাম তোমার বাবা মা আস্‌বেন, বৌমারা আস্‌বেন, তোমার কয় ভাই-ই আস্‌বে। এই উপলক্ষে কয়েকদিন মহানন্দে কাটাব। তা' নয়, তোমাকে পাঠিয়ে তোমার বাবা নিমন্ত্রণ রক্ষা করলেন। আমিও দুই পয়সার পোষ্টকার্ড লিখে নিমন্ত্রণ রক্ষা করব। যাক্, এখন সব দেখেশুনে নাও ; যাতে বিয়েটা সুসম্পন্ন হয়, তার ভার তোমাদের উপর দিলাম ; তোমরা যে আমার ঘরের ছেলে।

শ্রীপতিবাবু আমাকে একটা ছোটঘরে নিয়ে গিয়ে বল্‌লেন—দেখ দীনেশ, এই ঘরটা তোমাদের জন্য রিজার্ভ করে রেখেছি। নানা লোকজনের গোলমালে তোমার বিশ্রামের ব্যাঘাত না হয়, সেইজন্য এই ব্যবস্থা। তুমি আর রমেশ ছাড়া এ ঘরে কারও নো এড্‌মিশন। তোমাদের স্যুটকেশ, বিছানা, এই ঘরে পাঠিয়ে দিচ্ছি।

শ্রীপতিবাবুর কথা শুনে আমি ভারী লজ্জিত হলাম ; বল্‌লাম—

আমরা কি আরাম বিশ্রাম করবার জন্য এসেছি, আমরা কি মহামান্য অতিথি? আমরা এসেছি খাটতে।

শ্রীপতিবাবু হেসে বললেন, সে ত ঠিক কথা। তা' হ'লেও শেষ-রাত্রে একটু গড়াগড়ি দেবার নির্দ্দিষ্ট স্থান থাকা ভাল, তাই এটুকু ক'রে রেখেছি।

শনিবারের কথা। শুনলাম, বরের বাড়ী এ পাড়াতেই; বিবাহের লগ্ন রাত্রি সাড়ে ন'টায়। বরযাত্রীর হাঙ্গামা নেই; যাঁরা বরযাত্রী, তাঁরাই কন্যাযাত্রী। প্রায় চার-পাঁচ শ' লোকের আহারের আয়োজন হয়েছে। বর আসবে রাত আটটার পরে।

যখন শ্রীপতিবাবুর সঙ্গে আমি কথা বলছিলাম, সে সময় রমেশ সেখানে ছিল না। আমি দেখলাম এই সুযোগ। এখন আমলা-বেড়ে যাবার ব্যবস্থার কথা শ্রীপতিবাবুকে না বললে এর পরে আর হ'য়ে উঠবে না, বিয়ের দিকেই সকলে যাবেন।

আমি তখন শ্রীপতিবাবুকে বললাম, আমার একটা কাজ এখনই করে দিতে হচ্চে, এর পর গোলমালে আর হ'য়ে উঠবে না।

শ্রীপতিবাবু বললেন, এমন কি জরুরি কাজ তোমার পড়ল যে, এখনই না করলে হবে না। কি কাজ বল ত?

আমি বললাম, কাল খুব ভোরে আমি রমেশকে সঙ্গে নিয়ে তাদের গ্রাম আমলাবেড়ে যেতে চাই। দুই প্রহরের মধ্যেই ফিরে আসব। শুনেছি, গরুর গাড়ী ছাড়া সেখানে যাবার অন্য উপায় নেই। আপনাকে এখনই একখানি গাড়ী ঠিক করে দিতে হবে; আমরা শেষ রাত্রিতেই রওনা হব।

শ্রীপতিবাবু বললেন, তুমি যাবে গরুর গাড়ীতে। কখনও এ

সুন্দর যানে চড়েছ? না, না, ও হবে না। কাল যাওয়াও হবে না, গরুর গাড়ীতেও নয়। পরশু পাল্কী ঠিক ক'রে দেব, তাইতে যাবে; বিশেষ কষ্ট হ'বে না।

আমি বল্‌লাম, আগে শুনুন আমার কথা। রমেশকে আগে থাকৃতে জান্‌তে দে'ওয়া হবে না যে, আমি তাদের বাড়ী যাব; তা' হ'লে সে মহা গণ্ডগোল বাধাবে। তাকে সময়কালে জোর ক'রে নিয়ে যাব। সে কি আর পাল্কীতে যেতে স্বীকার করবে। তাই বাবা-মা গরুর গাড়ীর কথাই বলে' দিয়েছেন। আপনি যে বল্‌ছেন, আমি গরুর গাড়ীতে যেতেই পারব না, সে আপনার মিথ্যা আশঙ্কা। আমি সব পারি। এই যে পাঁচ-ছয় ক্রোশ পথ—এ আমি হেঁটেই যেতে পারি অনায়াসে; তা' হ'লেও সঙ্গে একটা কোন যান থাকা ভাল; আর কিছু জিনিষপত্রও সঙ্গে যাবে, তাই গাড়ীর কথা বল্‌ছি। মা বারবার বলে' দিয়েছেন, কালই আমলাবেড়ে যেতে। সেখান থেকে ফিরে এসে আপনাদের কাছে আত্ম-সমর্পণ করব; আপনারা যেদিন ছেড়ে দেবেন, সেইদিন কোলকাতায় যাব।

শ্রীপতিবাবু বল্‌লেন, তাই ত হে দীনেশ, আজ সারারাত্রি পরিশ্রম ক'রে ক্লান্ত হয়ে পড়বে, বিয়ের ব্যাপার মিটতে যেমন ক'রে হোক্ একটা-দুটো বেজে যাবে। তারপর ঘণ্টাখানেক বাদেই কি ক'রে যাবে?

আমি বল্‌লাম, সে আমি ঠিক পারব, তার জন্য আপনি ব্যস্ত হবেন না। এখনই একখানা গাড়ী ঠিক করে দিন। গাড়োয়ান যেন রাত দুটো-তিনটের সময়,এমন কি তারও আগে এসে আমাদের নিয়ে যায়। যত শীঘ্র যেতে পারব, ততই ভাল; ফিরতে বিলম্ব হবে না।

শ্রীপতিবাবু বল্‌লেন, তোমার বাবা-মা যখন আদেশ করেছেন, তখন আমি বাধা দেব না, বাবাকেও জানাব না। তিনি এ কথা শুন্‌লে কিছুতেই যেতে দেবেন না। গাড়ীর জন্য ভাবতে হবে না, আমি এখনই ঠিক্ করে দিচ্ছি। এই মাসখানেক আগে আমাকে একটা কাজের জন্য পলাশপুরে যেতে হয়েছিল। সেখানে যেতে গেলে আমলাবেড়ে গ্রামের ভিতর দিয়ে যেতে হয়। আমাদের হরিশ গাড়োয়ান আমাকে নিয়ে গিয়েছিল। সে এখন আমাদের বাড়ীতেই কাজ করছে। তাকে আমি ডেকে এনে বলে দিচ্ছি। তুমি যখন বল্‌বে, তখনই সে তোমাদের নিয়ে যাবে।

এই বলে' তিনি যেতে উদ্যত হ'লে আমি বল্‌লাম—দেখুন, রমেশ যেন কোনরকমে এ কথা আগে থাকতে জান্‌তে না পারে।

শ্রীপতিবাবু বল্‌লেন, সে আমি বুঝেছি। রমেশ অতি গরীব, চাষী গৃহস্থ। তার বাড়ীতে তোমার মত লোককে নিয়ে যেতে সে কিছুতেই স্বীকার হবে না, তা' আমি জানি। তাকে জোর ক'রেই নিয়ে যেতে হবে। এই ব'লে তিনি চলে' গেলেন।

একটু পরেই হরিশকে নিয়ে তিনি এলেন। হরিশ বল্‌ল—এখানকার কাজ মিটে গেলেই সে গাড়ী আনবে। রাত একটা দুটোর সময় বেরুলে ভোর হ'তে না-হ'তেই সে আমাদের আমলাবেড়ে পৌঁছে দেবে। সোজা রাস্তায় গেলে ছয় ক্রোশই বটে, এখন মাঠে চাষ হচ্ছে না, মাঠ দিয়ে গেলে প্রায় একক্রোশের বেশী পথ কম হবে।

হরিশকে কিছু অগ্রিম দিতে চাইলাম। শ্রীপতিবাবু বল্‌লেন—তার দরকার নেই, সে পরে হবে।

এদিক ত ঠিক হয়ে গেল ; এখন রমেশ কি করে। আমি ঠিক্

করেছিলাম বুঝলে মা, রমেশ যদি নিতান্তই না যায়, তাকে মেদিনী-পুরে রেখে আমি একেলাই যাব। হরিশ গাড়োয়ান আমলাবেড়ে চেনে; রমেশের বাপের নাম সনাতন দাস, তাও আমি জানি। আমলাবেড়ে ত আর কোলকাতা সহর নয় যে, কারও নাম বল্‌লে কেউ চিন্‌বে না, কেমন মা!

মা বল্‌লেন, সে ত ঠিক কথা। সেইজন্যই ত তোকে পাঠিয়েছিলাম। তার পরে কি শুনি?

তার পর রমেশকে ডেকে বাজার থেকে পাঁচ টাকার মিষ্টান্ন এনে কাপড়-জামা সব দিয়ে বাড়ীর মধ্যে তত্ত্ব পাঠিয়ে দিলাম।

আর যাব কোথায় মা! দেখি হরেন্দ্রবাবু এসে উপস্থিত! এ সব কি করেছ হে দীনেশ, তোমার বাবা-মা বুঝি এই সব দিয়ে তাঁদের না আসায় লজ্জা ঢাকৃতে চেয়েছেন! কাজ ভাল হয় নি বাবা! তোমরা যে আমার ছেলের মত! এ যেন কুটুমবাড়ী তত্ত্ব পাঠানো! তুমি ছেলেমানুষ, তোমাকে আর কি বল্‌ব। বিয়ে মিটে যাক্, তারপর তোমার বাবা-মায়ের সঙ্গে ঝগড়া করবার জন্য আমাকে কোলকাতায় যেতে হবে।

আমি হেসে বল্‌লাম, এ যে শাপে বর হ'ল কাকাবাবু! যাক্, এই অপরাধে যে আপনার পায়ের ধূলো আমাদের বাড়ীতে পড়বে সেই আনন্দে আপনার ভৎর্সনা মাথা পেতে নিলাম।

—পাগল ছেলে! বলে' হাসতে হাস্‌তে হরেন্দ্রবাবু চলে' গেলেন।

তারপর মা, চা আর জলখাবার যা' এল, তার যদি বর্ণনা দিতে যাই, তা হ'লে তুমি যে মা, তুমিও আমাকে পেটুক বল্‌বে। সে

বর্ণনা আর করছি নে। খাবারগুলির সম্পূর্ণ সদ্ব্যবহার করলাম, যাতে রাত্রিতে আর খেতে না হয়!

দেখ্‌তে দেখ্‌তে সন্ধ্যা হয়ে এল। তখন আর কি, মহাসংগ্রামের বেশ। জামার হাতা গুটিয়ে কোমরে তোয়ালে জড়িয়ে, বিয়ের আসরে নেমে পড়লাম। কাজ যত করি না করি, দৌড়িয়ে চেঁচিয়ে বাড়ীটাকে একেবারে সরগরম ক'রে ফেললাম। হরেন্দ্রবাবু একবার আমার পিঠে হাত বুলিয়ে বল্‌লেন—এই ত চাই বাবা! আমার দীনেশ একাই এক সহস্র! গর্ব্বে আমার বুক ফুলে উঠ্‌ল। তখন আরও আগ্রহের সঙ্গে দৌড়াদৌড়ি আরম্ভ করলাম।

সাড়ে আটটার সময় বর এল। মেদিনীপুর সহর হ'লে কি হয়, এখনও পাড়াগাঁয়ের মতই ব্যবস্থা! শ'খানেক এসিটিলিন আলো, পাঁচ সাত দল বাজনদার, দিশী ব্যাণ্ড, ব্যাগপাইপ! ভাগ্যি বরকে যাত্রার দলের রাজা সাজিয়ে আনে নি, আর তাঞ্জামে চড়ায় নি! বড় একখানা ফিটন গাড়ীতে বর এল, ধুতি জামা চাদরে।

আরে রাম কহো মা! বর দেখেই আমি অবাক্! আমি মনে করেছিলাম, কে না কে বর! তা' নয় মা। তুমিও যে তাকে চেন; আমাদের বাড়ীতে সে কতবার এসেছে। বর হচ্ছেন আমার প্রেসিডেন্সী কলেজের সহপাঠী কল্যাণকুমার।

মা বল্‌লেন, তাই না কি, কল্যাণের সঙ্গে শ্রীপতির বোনের বিয়ে হ'ল! ছেলেটী বেশ। খুব ভাল হয়েছে!

আমি তখন এগিয়ে গিয়ে বল্‌লাম, কিরে কল্যাণ, তুই বর! যাক্, এতদিন পরে তোর শালা হ'তে হ'ল!

কল্যাণ হেসে বল্‌ল, তুই এখানে কি ক'রে এলি দীনেশ?

আমি বল্‌লাম—তোর শালা হবার জন্য এসেছি। তোর শ্বশুর হরেন্দ্রবাবু যে আমার কাকাবাবু! সবাই এ কথা শুনে হেসে উঠ্‌ল!

তারপর যা' করলাম মা, তা' তুমি 'বিশ্বাস করবে না। সেই রাত ন'টা থেকে একটা পর্য্যন্ত অবিশ্রান্ত পরিবেশন করে সেই পাঁচ-ছয়-শ' লোককে খাইয়ে দিলাম—একটুও বিশ্রাম করি নি। আমার এই পরিশ্রম দেখে সবাই অবাক্ হয়ে গিয়েছিল। আর তোমার ছেলে রমেশ কি করেছিলেন, জান মা! ঘণ্টাখানেক তাকে এদিক-ওদিক ঘুরতে দেখ্‌লাম, তারপর আর তার পাত্তা নেই। রাত একটার পর এক গ্লাস দই চুমুক দিয়ে আমাদের নির্দ্দিষ্ট ঘরে গিয়ে দেখি শ্রীমান্ রমেশচন্দ্র মহাসুখে নিদ্রা দিচ্ছেন। আমি তাকে না ডেকে তার পাশেই শুয়ে পড়লাম।

ঘণ্টাখানেকও যায় নাই, হরিশ গাড়োয়ান এসে ডাক্‌ল—বাবু উঠুন, রাত দুটো বেজে গিয়েছে। অমনি লাফিয়ে উঠ্‌লাম।

তারপর আমলাবেড়ে যাবার কাহিনী আজ আর নয় মা, আর এক সময় বল্‌ব। এই বলেই আমি ঘর থেকে বেরিয়ে এলাম।

এগার

এইবার শোন না, আমাদের আমলাবেড়ে যাওয়ার অবশিষ্ট কথাগুলো।

হরিশ গাড়োয়ান এসে ডাকবামাত্রই আমার ঘুম ভেঙ্গে গেল—ঘুম ত ভারি, ঘণ্টাখানেকেও শুই নি।

আমি তাড়াতাড়ি উঠে বল্‌লাম, হরিশ, এক কাজ কর; আমার এই বিছানাটা নিয়ে তোমার গাড়ীর মধ্যে আগে পেতে দাও। তারপর এসে আমাদের এই দুটো বাক্স আর ঐ হাঁড়িটা নিয়ে গাড়ীতে তুলে দেও। তোমার সঙ্গে লণ্ঠন আছে ত? না থাকে ত এই হ্যারিকেনটা নিয়ে যেও।

হরিশ বল্‌ল—লণ্ঠন নিতে হবে না, আমার গাড়ীতে আলো আছে। এই বলে সে আমার বিছানাটা তুলে নিয়ে গেল।

তোমার আদুরে ছেলে রমেশচন্দ্র তখনও ঘুমুচ্ছেন। হরিশ চ'লে গেলে আমি রমেশের গায়ে ঠেলা দিয়ে বল্‌লাম—এই রমেশ, শীগ্‌গির ওঠো।

রমেশ আমার কথা শুনতে পেলে কি না, বুঝতে পারলাম না। সে দেখি পাশ ফিরে শোবার আয়োজন করছে। আমি তখন তাকে আরও জোরে একটা ঠেলা দিয়ে বল্‌লাম—আর শুয়ে থাকতে হবে না, এখন ওঠো।

রমেশ উঠে ব'সে বল্ল—ছোড়-দা', রাত পুয়িয়েছে না কি ?

আমি বল্লাম—রাত পোয়াতে অনেক দেরী, এখন দুটো।

রমেশ বল্ল, রাত দুটোর সময় উঠে কি করব ?

—আমার সঙ্গে বেড়াতে যেতে হবে ?

—আপনি পাগল হয়েছেন না কি ছোড়-দা! রাত দুটোর সময় কি কেউ বেড়াতে বা'র হয়। পুলিশ ধরে নিয়ে যাবে চোর ব'লে।

—সে তোমাকে ভাবতে হবে না, তুমি এখন গাত্রোত্থান কর, দেরী হয়ে যাচ্ছে।

এই সময় হরিশ গাড়োয়ান ঘরের মধ্যে এসে বল্ল—বাবুজি, খুব পুরু ক'রে খড় বিছিয়ে তার ওপর বিছানা পেতে দিয়েছি। আমি বাক্স দুটো, আর হাঁড়িটা নিয়ে যাই; আপনারা আসুন, দেরী করবেন না।

রমেশ আমার দিকে চেয়ে বল্ল, আমি ত কিছু বুঝতে পারছি নে ছোড়-দা', কোথায় যেতে হবে এত রাত্রে ?

আমি বল্লাম, তোমাকে কিছু বুঝতে হবে না ; আমি যেখানে নিয়ে যাব, সেখানেই তোমাকে যেতে হবে।

রমেশ বল্ল, তবুও শুনি না। আমার এ দেশ। আপনি ত এখানকার কিছু জানেনও না, চেনেনও না।

আমি বল্লাম, সেজন্য তোমার ভাবনা নেই। আমি সব জানি। আমি কোথায় যাব শুন্বে ? আমি তোমাকে সঙ্গে নিয়ে আমলাবেড়ে যাব। বাইরে গরুর গাড়ী দাঁড়িয়ে আছে। এখনই যাত্রা না করলে ভোর পর্য্যন্ত সেখানে পৌছান যাবে না।

রমেশ যেন আকাশ থেকে পড়ল ! সে অবাক্ হ'য়ে আমার দিকে খানিকক্ষণ চেয়ে থাক্‌ল, কি যে বল্‌বে, তা' যেন ভেবে পেল না। তারপর ব'লে উঠ্‌ল—সে কি কথা ! আমলাবেড়ে যাবেন কেন ?

যাব আমার খুসী ! তোমার কাছে তার জবাব আমি দেব না। এখন ওঠো, সুবোধ ও সুশীল বালকের মত আমার সঙ্গে এস।

রমেশ বল্‌ল, সে হ'তেই পারে না ছোড়-দা' ! আমলাবেড়ে আমাদের বাড়ীতে যাবেন আপনি—পাগল হয়েছেন না কি ? আপনার মত বড়-মানুষের ছেলের বস্‌বার দূরে থাক, দাঁড়াবার মত স্থানও আমার বাড়ীতে নেই। সেখানে যাবেন আপনি ? হ'তেই পারে না ! আপনাকে আমি কিছুতেই যেতে দেব না ! আপনি জানেন না, আমরা কত গরীব। আমাদের ঘর-দুয়ার নেই বল্‌লেই হয় ; কোন রকমে দিন চলে। আর, আপনি বল্‌ছেন কি না, আমার বাড়ীতে যাবেন। বলেছি ত, দাঁড়াবার যায়গাও আমার বাড়ীতে নেই। আপনাকে খেতে দিতে পারি, এমন সঙ্গতিও আমার নেই। আমরা যে দীনহীন দরিদ্র।

আমি বল্‌লাম, দেখ রমেশ, আমার ধারণা ছিল তুমি একটা ছেলের মত ছেলে ! এখন দেখছি আমার সে ভুল। তুমি দরিদ্র ব'লে নিজেকে দীনহীন মনে করছ ;—এত দুর্ব্বল তুমি ? দারিদ্র্যের যে একটা মহা গৌরব আছে, তা' তুমি বোঝ না, এইটাই আমার কাছে আশ্চর্য্য বোধ হচ্ছে ! যাক্ সে কথা, আমি বল্‌ছি, আমি আমলাবেড়ে যাবই। বাড়ী থেকে মা, বাবা, দাদারা আমাকে

সেই আদেশ দিয়ে পাঠিয়েছেন। আমাকে যেতেই হবে। তুমি যেতে না চাও, যেও না, এখানেই থাক ; আমি একাই যাব। হরিশ গাড়োয়ান আমলাবেড়ে গ্রাম চেনে। সেখানে গিয়ে তোমাদের বাড়ী খুঁজে নিতে আমার কষ্ট হবে না। সে আমি পারব। তুমি থাক, আমি চল্লাম, আর দেরী করতে পারব না, আমাকে হয় ত আজই ফিরে আস্‌তে হবে।

এই ব'লে আমি যখন ঘর থেকে বেরিয়ে যাবার উপক্রম করলাম, তখন মা, রমেশ আর চুপ ক'রে ব'সে থাক্‌তে পারল না ; উঠে বল্‌ল—ছোড়-দা', ব'লে দিচ্ছি, আজ আপনার অদৃষ্টে অনেক কষ্ট আছে। যখনই যাবেন, চলুন, আমিও সঙ্গে যাই। কিন্তু আমাকে যে বিপদে ফেল্‌লেন ছোড়-দা', তা' আমলাবেড়ে গেলেই বুঝতে পারবেন। পাড়াগাঁ কি রকম, গরীবের সংসার যে কি, তাত জানেন না। এই ব'লে রমেশ একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেল্‌ল।

আমি তার হাত ধ'রে গাড়ীর কাছে নিয়ে যেতে যেতে বল্‌লাম—দেখ রমেশ, তুমি কাতর হোয়ো না, নিজেকে অত তুচ্ছ মনে করো না। আমার কোন কষ্ট হবে না। আমি কল্‌কাতা থেকে আস্‌বার সময় মা সব ব্যবস্থা ক'রে দিয়েছেন, সব জিনিস সঙ্গে দিয়েছেন, তোমাকে বিব্রত হ'তে হবে না। তুমি শুধু আমার সঙ্গে যাবে নিতান্ত অপরিচিতের মত। যা' কিছু সব ব্যবস্থা আমি করে নেব। এই ব'লে রমেশকে, বল্‌তে গেলে টেনে নিয়ে গরুর গাড়ীতে তুললাম। গাড়োয়ানও তৎক্ষণাৎ গাড়ী ছেড়ে দিল।

রমেশ গাড়ীতে উঠে কিছুক্ষণ চু'প করে ব'সে রইল, একটা কথাও বল্‌ল না। তাকে চুপ ক'রে থাক্‌তে দেখে আমি বল্‌লাম,

রমেশ, তোমার যদি ঘুম পেয়ে থাকে, তা' হ'লে শুয়ে পড়, বেশ সুন্দর বিছানা হয়েছে। আমি আর শোব না। আমি এই চাঁদের আলোতে মাঠের আর জঙ্গলের শোভা দেখ্‌তে দেখ্‌তে যাব। তুমি বলেছিলে, এখান থেকে আমলাবেড়ে ছয় ক্রোশ পথ; গাড়োয়ানও বলেছে, ঘোরা পথে ছয় ক্রোশই বটে। এখন মাঠের চাষ উঠে গেছে; এখন গাড়ী মাঠের মধ্য দিয়ে যাবে; তাতে প্রায় দুই ক্রোশ পথ কমে যাবে। আমরা তা' হ'লে ভোর হ'তে-না-হ'তেই তোমাদের বাড়ীতে গিয়ে উঠব। খবর না দিয়ে হঠাৎ ভোরবেলা আমাদের দেখে তোমার মা, তোমার দিদি একেবারে অবাক্ হয়ে যাবেন। আমি সেই আনন্দের কথাই ভাবছি রমেশ!

রমেশ বল্‌ল, আর আমি ভাবছি, আপনাকে দেখে তাঁরা আশ্চর্য্য বোধ করবেনই, আর তার সঙ্গে সঙ্গে ভেবে পাবেন না যে আমি কেমন ক'রে আপনাকে আমাদের সেই জরাজীর্ণ কুঁড়ে ঘরে নিয়ে এলাম।

আমি বল্‌লাম—কোন ভয় নেই শ্রীমান্ রমেশচন্দ্র! আমি সে সব ঠিক ক'রে নেব। তুমি হয় ত ভাবছ, তাই ত ছোট-দা' যে ঘুম থেকে উঠেই চা খান; আমলাবেড়ে কেন, আশপাশের দশখানি গ্রামেও চায়ের সন্ধান মিল্‌বে না। কেমন? সে ভাবনা তোমাকে করতে হবে না; আমার মা আর বৌদিদিরা সব গুছিয়ে দিয়েছেন। ঐ যে প্রকাণ্ড ট্রাঙ্কটা দেখ্‌ছ, এতে সব আছে। পাছে তোমাদের গ্রামে ভাল জল না মেলে, তার জন্য এক বোতল কলের জল পর্য্যন্ত ঐ ট্রাঙ্কে আছে, বুঝলে!—চা, চিনি, কন্‌ডেন্স মিল্ক, বিস্কুট, রুটি, সব আছে। কোন ভয় নেই। ষ্টোভ পর্য্যন্ত

আছে। তারপর আহারের কথা—তোমার মা, তোমার দিদি দুটো বেগুন ভাতে দিয়ে চারটী ভাত রেঁধে দিলে আমি তা' পবিত্র মহাপ্রসাদ ব'লে পরম পরিতৃপ্তির সঙ্গে খাব। তুমি নিশ্চিন্ত মনে শুয়ে পড়, আর রাত জেগো না। ওহে বাবা হরিশ্চন্দ্র, আর কতদূর।

হরিশ হেসে বল্‌ল, বাবুজি, এখনও সিকি পথও আসি নি, এখনই কতদূর। ভোর হ'তে-হতেই আমলাবেড়ে পৌঁছে দেব। বাবুজি, আপনিও একটু গড়িয়ে নিন।

আমি বল্‌লাম—না হরিশ, আমি আর শোব না। আমরা কল্‌কাতার লোক; এমন সুন্দর মাঠের মধ্যে দিয়ে এই জ্যোৎস্না রাত্রে কখনও পথ চলি নি। আমার ভারি ভাল লাগছে এ সব।

রমেশ আর কোন কথা না ব'লে দিব্বি শুয়ে পড়ল, আর দেখ্‌তে দেখ্‌তেই নিদ্রাগত। আমিও তার হাত থেকে নিস্তার পেয়ে নিশ্বাস ছেড়ে বাঁচলাম।

তুমি বিশ্বাস করবে না মা, আমি সে রাত্রে একটুও ঘুমোই নি। শুনেছিলাম গরুর গাড়ীতে যেতে না কি ভারি কষ্ট হয়। আমার মোটেই হয় নি। গাড়ীর ঝাঁকুনী প্রথমে একটু খারাপ বোধ হয়েছিল, তারপর আর কিছু না।

ঘণ্টা-তিনেক এই ভাবে চ'লে আমরা যে গ্রামে পৌঁছলাম, গাড়োয়ান বল্‌ল—এই আমলাবেড়ে। তখন ভোর হয়েছে, সূর্য্য তখনও ওঠে নাই। তোমার রমেশচন্দ্র মা, তখনও ঘুমে অচেতন। আমি তাকে একটা ঠেলা দিয়ে বল্‌লাম—এই রমেশ, ওঠো, আমরা আমলাবেড়ে এসেছি। এখন তোমার বাড়ীর পথ গাড়োয়ানকে ব'লে দাও।

রমেশ তাড়াতাড়ি উঠে বাহিরের দিকে চেয়ে গাড়োয়ানকে

পথের সন্ধান দিল। তারপর তিন চার মিনিটের মধ্যেই আমাদের গাড়ী একেবারে একটা বাড়ীর উঠানে গিয়ে দাঁড়াল।

বাড়ীর কেউ তখনও ওঠেন নি। রমেশ গাড়ী থেকে নেমে ডাক্‌ল—মা, দিদি!

দেখ মা, 'মা' ব'লে আমরাও ত তোমাকে দিনরাত ডাকি, 'দিদি'কে কত ডাকি; কিন্তু, সেদিন রমেশের ঐ 'মা', 'দিদি' ডাকের মধ্যে যে কি সুধা ছিল, কি ব্যাকুলতা ছিল, সে কথা আমি তোমাকে বল্‌তে পারছি না;—সে ডাকে আমাদের রক্ত-মাংসের প্রত্যক্ষ মা কেন, স্বয়ং জগজ্জননীর আসনও নিশ্চয় টলে। এমন মধুমাখা 'মা', 'দিদি' সম্বোধন আমি কখনও শুনি নি।

রমেশের ডাক শুনে ঘরের মধ্যে থেকে উত্তর এল—কে বাবা রমেশ এলি। ও দুর্গা, শীগ্‌গির ওঠো মা, রমেশ এসেছে।

যেমন ডাক, তেমনি তার উত্তর! আমার শ্রান্ত-ক্লান্ত শরীর-মন যেন জুড়িয়ে গেল।

তাড়াতাড়ি দুয়ার খুলে একসঙ্গে মা ও মেয়ে বেরিয়ে এলেন।

রমেশ বল্‌ল—আমি একা আসি নি মা! আমার সঙ্গে দীনেশ দাদা এসেছেন।

এই কথা শুনেই মা ও মেয়ে মাথার কাপড় টেনে দিতে গেলেন। আমি তখন এগিয়ে গিয়ে প্রণাম ক'রে বল্‌লাম—মা, দিদি, আমি যে রমেশের দাদা, আমাকে দেখে আপনারা লজ্জা করছেন কেন? রমেশ, তুমি মা, দিদিকে প্রণাম করলে না। ভুলে গেলে বুঝি।

রমেশ বলল, ছোড়-দা', আপনার প্রণামেই আমারও প্রণাম করা হয়ে গেছে।

বারো

এইবার মা, এ ভ্রমণ-বৃত্তান্ত শেষ করে' ফেলি।

রমেশের বাড়ীর কথাই আগে বলি। বাড়ীতে তিনখানি ঘর; একখানি একটু বড়, আর দু'খানি ছোট। মাটীর দেওয়াল, তার ওপর খড়ের চাল। যেখানি বড় ঘর, তার একটা বারান্দা আছে; আর দু'খানি ঘরের বারান্দা নেই। বড়খানিই শোবার ঘর, আর তার বারান্দাই বস্‌বার স্থান। আর দু'খানি ছোট ঘরের একখানি গরুর ঘর; অপরখানির একদিকে উঁচু মাচা বেঁধে তার ওপর ধান বোঝাই করা থাকে, অপর দিকে রান্না হয়। বাড়ীর উঠানটা বেশ বড়। তিন দিকে তিনখানি ঘর, আর একদিকে কতকগুলো গাছ-পালা। বাইরে বস্‌বার ঘরও নেই, বাড়ীর চারদিকে পাঁচিল কি বেড়া কিছুই নেই। যেদিকে গাছপালা, তারই পিছনে একটা ডোবা; শুনলাম, তাতে বার' মাসই জল থাকে। সেই জলই এদের সম্বল; তাতেই স্নান, সেই জলই খাওয়া, সেই জলে কাপড় ধোওয়া সব। এই ডোবাতে মাছও আছে। উঠানের ধারে ধারে শাক্ সবজীর ক্ষেত; একটু উঁচু করে' মাটী দিয়ে বাঁধানো একটা মঞ্চ, তা'তে তুলসীগাছ। উঠানটা এমন পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, যে দেখলে চোখ জুড়িয়ে যায়। আর একটা কথা বল্‌তে ভুলে গিয়েছি; যেখানি

রান্নাঘরই বল বা গোলাঘরই বল, তারই গায়ে একখানি চালা আছে ; তারই নীচে ঢেঁকি।

এই যা' বল্‌লাম রমেশদের বাড়ীর কথা, তার থেকে তুমি যে একটা আইডিয়াও করতে পারলে না মা, তা' তোমার মুখ দেখেই বুঝতে পারছি। তুমি হয় ত ভাবছ, এ কেমন বাড়ী। মেটে ঘর, মাটীর দাওয়া, চারদিকে জঙ্গল, বাড়ীর আবরণ নেই, বাইরে বস্‌বার ঘর নেই, চার পাশ খোলা—এ কি বাড়ী! তা' কিন্তু নয় মা, রমেশদের সেই পত্রকুটীর, সেই অনাড়ম্বর সৌন্দর্য্য, সেই ক্ষেতের ধানের মোটা লাল চালের ভাত, সেই ডোবা থেকে তখন-তখনই ধরা ছোট-ছোট পুঁটিমাছ ভাজা, তারই চচ্চড়ি, ঘরের গাইয়ের অমৃত সমান দুধ—এ সব যে কি মনোহর, কি তৃপ্তিকর মা, তা' তোমাকে কেমন করে' বোঝাব। আর রমেশের মা, দিদির সেই যে আকিঞ্চন, সেই স্নেহভরা আগ্রহ, সেই যে প্রাণপণ যত্ন, একেবারে অনির্ব্বচনীয় মা, অনির্ব্বচনীয়—বর্ণনার অতীত! আমার ইচ্ছা করছিল, এখনও ইচ্ছা করছে, সেই পাখী-ডাকা, ছায়ায়-ঢাকা, পল্লীর বিলাসশূন্য নির্জ্জন নেপথ্যে জীবন কাটিয়ে দিই। সত্যই মা, আমি বুঝতে পারি নে, রমেশ ষ্টুপিডটা অমন স্বর্গভোগ ছেড়ে আমাদের ক'লকাতার এই নরকে থাক্‌তে এল কেন? কিসের অভাব ওর? ঘরভরা ধান, ডোবায় মাছ, গোয়ালে দুগ্ধবতী গাই, উঠানের পাশে লাউ-কুমড়া, শাক-তরকারীর ক্ষেত, সজনে গাছ, আম-কাঁঠালের বাগান, বড় বড় নারকেল গাছ, তা' হোক্ না সংখ্যায় কম—এ কি কম সম্পদ রমেশের! তারপর অমন স্নেহময়ী দিদি, অমন দেবীস্বরূপিণী মা যার ঘরে, তার অভাব কিসের বল ত মা? আমি কবিত্ব করছি নে

মা, সত্যি বল্‌ছি—আমার যে কি আনন্দ হয়েছিল, তা' তোমাকে বোঝাতে পারছি নে !

সে কথা যাক্, রমেশের বাড়ীতে উঠে কি করলাম সেই কথা বলি।

রমেশের মা তাঁদের সেই বারান্দায় একখানি পুরাণো মাদুর তাড়াতাড়ি এনে পাততে পাততে বল্‌লেন, বাবা, বস্‌তে যে দেব তার যায়গাও নেই, কিসে যে বসাব আপনাকে, তাও ভেবে পাচ্ছি নে। গরীবের বাড়ীতে যখন পায়ের ধূলো দিয়েছেন, তখন এই ছেঁড়া মাদুরেই বস্‌তে হবে।

আমি তখনও উঠানে দাঁড়িয়ে আছি। সেখান থেকেই বললাম, মা গো, এই সারাপথ আপনার ঐ ছেলের 'তাই ত, তাই ত' শুন্‌তে শুন্‌তে এসেছি; আবার এখন আপনিও তাই আরম্ভ করলেন। ও-সব আপনি, মশায়, পদধূলি, আর যা' কিছু আপনার গুরুদেবের জন্য তুলে রাখুন; আমি ঘরের ছেলে ঘরে এসেছি—ব্যস্।

দিদি হেসে বললেন, ঠিক বলেছ ভাই। তুমি যদি তাই না ভাবতে, তা' হ'লে আসবে কেন? এ তোমারই বাড়ী। এটা গরীবের বাড়ী ত নয়, ক'লকাতার দীনেশ সিংহের বাড়ী—কেমন? তোমায় এর আগে কখনও দেখি নি ভাই, কিন্তু রমেশের চিঠিতে তোমাদের কথা শুনে যা' ভেবে রেখেছিলাম, তাই দেখছি। তোমার কথা শুনে শরীর জুড়িয়ে গেল। কে বলে আমরা গরীব, আমরা চাষা? আজ দেখে যাক্, আমরাই বা কি, আর নাড়াজোলের রাজাই বা কি?

আমি বল্‌লাম, এই ঠিক হয়েছে দিদি! ও হে রমেশ, ইডিয়টের

মত দাঁড়িয়ে ভাবছ কি ? ঐ সব জিনিসগুলো নামাও। বাবা হরিশ, তুমি একটু সাহায্য কর। দেখুন দিদি, এক কাজ করুন। উঠানের পাশে ঐ যে উনোনটা দেখ্‌ছি, ঐতে আগুন করুন ত চট্‌পট। আর যা' করতে হয়, আমি করছি, একটু চা খেতে হবে যে।

রমেশ এতক্ষণে কথা বল্‌ল। কি বল্‌ল জান মা ? বল্‌ল, আমাদের গাঁয়ে চা পাওয়া যায় না যে।

আমি বল্‌লাম, সে আমি জানি শ্রীমান্ রমেশচন্দ্র। ওহে বাপু হরিশ, আগে ট্রাঙ্ক দুটো নামাও ত, তারপর হাঁড়িটা, শেষে বিছানা-পত্র, বুঝলে।

দিদি একেবারে তৎপর ; তখনই উনোন ধরাতে বসে' গেলেন। আমি একটা ট্রাঙ্ক টেনে নিয়ে খুলে ফেলে চায়ের সরঞ্জাম, মায় কেটলি, জলের বোতল বা'র করে' রমেশকে বল্‌লাম, এইবার জল গরম করে' চা তৈরী কর ত ভাই। দেখ দেখি সব আছে কি না। কিছুর অভাব নেই ; এ আমার মা জননীর গোছানো।

রমেশের মা বললেন, বাবা, চা'ল-ডালও এনেছ না কি ?

আমি বল্‌লাম, আপনার ছেলে হয়ে' এত বেয়াদবি করতে পারি নে। যা' সব এখানে হয় ত পাওয়া যাবে না মনে হয়েছে, মা তাই গুছিয়ে দিয়েছেন।

রমেশ তখন ধীরে-সুস্থে চা তৈরী করল। আমি, রমেশ আর হরিশ, এই তিনজনে চা খেয়ে ঠাণ্ডা হয়ে, রমেশের দিদিকে ডেকে অপর ট্রাঙ্কের চাবী তাঁর হাতে দিয়ে বল্‌লাম, এ বাক্সে যা' আছে, তার জন্য আমি দায়ী নই দিদি ! তার জন্য যদি ঝগড়া করতে হয়, তা' হ'লে ক'লকাতায় আমার মায়ের কাছে যেতে হবে ; আর সেই

জন্যই মা আমাকে পাঠিয়েছেন। আমি আপনাদের বাড়ী-ঘর দেখতে আসি নি, আপনাদের ক'লকাতায় আমাদের বাড়ীতে নিয়ে যেতে এসেছি।

দিদি হেসে বল্লেন, সে কথা পরে হবে। এখন কিছু খেতে হবে ত। তুমি যা' এনেছ, তা' খেতে পাবে না ভাই। কাল আমি মুড়ি ভেজেছি, তাই খেতে হবে।

আমি বল্লাম, বেশ ত, তাই খাব।

রমেশ বলল, ছোড়-দা', কখন মুড়ি খেয়েছ ?

আমি বললাম, আমি কি রাজা, না মহারাজ যে, মুড়ি খাই নি।

তারপর মা, তেল, নুন আর কাঁচা লঙ্কা দিয়ে একরাশ মুড়ি খাওয়া হ'ল। রমেশের তখন আনন্দ দেখে কে! হরিশকে সঙ্গে নিয়ে জাল হাতে করে' সে ডোবায় মাছ ধরতে গেল। আমি আর গেলাম না, আমি তখন ট্রাঙ্কের মধ্যে তুমি যা' সব দিয়েছিলে, তাই দিদিকে বুঝিয়ে দিতে লাগলাম। দিদি যত বলেন, এ সব কেন ভাই ? আমার একই উত্তর, ক'লকাতায় গিয়ে মায়ের সঙ্গে এ নিয়ে যত পারেন ঝগড়া করবেন।

দিদি নিরুত্তর।

রমেশ মাছ ধরতে গিয়েছিল। এই হচ্ছে আসল কথা জিজ্ঞাসা করবার সুযোগ।

আমি দিদিকে জিজ্ঞাসা করলাম, আচ্ছা দিদি, আপনি বলতে পারেন, রমেশের চাকুরী করবার এত ঝোঁক পড়েছিল কেন ? আর পাঁচ-শ' টাকা জমাবারই বা তার এত কি দরকার হয়েছে ? ধার-কর্জ্জ কিছু আছে কি ?

দিদি বললেন, না ভাই, বাবা এক পয়সাও ধার রেখে যান নি। তিনি এই বছর খানেকের বেশী হ'ল মারা গিয়েছেন, এর মধ্যে আমাদের ধার করবার কিছু দরকার হয় নি। যা' সামান্য কয় বিঘে জমি আছে, নিতান্ত অজন্মার বছরেও তা'তে যা' ধান হয়, তাইতে আমাদের বেশ চলে যায়। যেবার ভাল জন্মায়, সেবার কিছু ধান আমরা বেচেও থাকি। সামান্য গরীব মানুষের যা' দরকার, তার অভাব কোন দিনই হয় না। তবুও রমেশের কি জেদ, তার পাঁচ-শ টাকা চাই-ই। বাবা মারা যাবার পরই তার মাথায় এই পাঁচ-শ টাকার খেয়াল চেপেছে। তাই সে চাকরী করতে গিয়েছে। এখন দেখছি, রমেশ ভালই করেছে। তার এই খেয়ালের জন্যই ত তোমাদের পেয়েছি। এ কি কম লাভ ভাই!

আমি বললাম, এ খেয়ালের কারণ যে কি, তা আমরা মোটেই জান্‌তে পারি নি। মনে করেছিলাম, আপনারা নিশ্চয়ই জানেন। এখানে খরচ পাঠাবার কথা বললে রমেশ বলে, দরকার হবে না; যা' জমাজমি আছে, তাতেই বাড়ীর খরচ চলে' যাবে। তার কাছে শুনেছি, পাঁচ-শ'টাকা জমা হ'লে সে চাকরী ছেড়ে দিয়ে বাড়ী আসবে, আর চাকরী করবে না। কি করবে ও টাকা দিয়ে, তা' বুঝতে পারিনে।

দিদি বললেন, আমাদের কাছেও সে ঐ কথাই বলে, বিশেষ কিছুই বলে না।

রমেশ তখন কতকগুলো পুঁটি মাছ নিয়ে এসে বললে, ছোড়-দা' আপনার অদৃষ্টে নেই, কি করব, একটাও বড় মাছ পাওয়া গেল না।

আমি বললাম, বেশ হয়েছে, ঐ ছোট মাছেই হবে।

তারপর মা, রমেশকে সঙ্গে নিয়ে গ্রাম দেখতে বা'র হলাম।

ছোট গ্রাম, কুড়ি-পঁচিশ ঘর গৃহস্থ। সবারই অবস্থা রমেশেরই মত, সবাই চাষ-বাস করে। বেশ আছে মা, তারা। তাদের কোন কষ্ট আছে বলে' মনে হ'ল না।

দুপুরবেলা যা' খাওয়া হ'ল, তার বর্ণনা করে' তোমার লোভ বাড়াব না। তবে, এ-কথা না বললে মিথ্যা বলা হবে মা, তুমি কিন্তু সেই মোটা রাঙা চালের ভাত খেতে পারতে না। আমার কিন্তু ভারি মিষ্টি লেগেছিল !

তারপর রমেশের মা ও দিদিকে এখানে আস্‌বার জন্য অনেক বললাম, অনেক অনুরোধ করলাম ; তাঁদের ঐ এক কথা, রমেশ তার পাঁচ-শ'টাকা নিয়ে বাড়ী এলে, তাঁরা মা-মেয়ে আপনা হ'তে কলকাতায় এসে তোমাদের পায়ের ধূলো নিয়ে যাবেন।

তখন আর কি করব, বিকেলেই মেদিনীপুরে ফিরবার ব্যবস্থা করলাম। রাত্তিরটা থাকবার জন্য তাঁরা অনেক অনুরোধ করলেন ; শীগ্‌গির আবার আসব বলে' তাঁদের নিরস্ত করলাম। রমেশকে দু'-একদিন বাড়ীতে থাকবার জন্য বললাম; সে তাতে সম্মত হ'ল না। কাজেই তাকে সঙ্গে নিয়ে প্রায় চারটের সময় যাত্রা করলাম। রাত প্রায় আটটার সময় মেদিনীপুরে পৌঁছলাম। পরের দিনটা সেখানে কাটিয়ে, তারপর আর কি, মায়ের ছেলে মায়ের কাছে এসে পড়েছি। আমার ভ্রমণ-বৃত্তান্ত শেষ হ'ল, এখন কি পুরস্কার দেবে বল ?

মা বললেন—তোদের অদেয় আমার কি আছে বাবা !

তেরো

(যোগেন্দ্র বাবুর কথা)

এক বৎসর পরের কথা।

একদিন রাত্রি প্রায় সাড়ে ন'টার পর আহারাদি শেষ করে' আমি আমার শোবার ঘরে একখানি ইজি-চেয়ারে শুয়ে সেদিনকার খবরের কাগজের একটা প্রবন্ধ পড়ছি; আমার গৃহিণী মেজেয় বসে' কি যেন করছিলেন, এমন সময় রমেশ ঘরের মধ্যে এসে আমার গৃহিণীর পাশে মেজেতে বস্‌ল।

আমি তার দিকে চেয়ে বল্‌লাম. কি রমেশ, খাওয়া-দাওয়া ত অনেকক্ষণ হয়ে গিয়েছে। এখনও শোও নি যে!

রমেশ বল্‌ল, আমি এত সকালে কোনদিন শুই না। ছোড়্-দা'র কাছেই ত দশটা সাড়ে দশটা পর্য্যন্ত থাকি।

আমি বল্‌লাম, আজ তা' হ'লে দীনেশের দরবার থেকে এত আগেই বেরিয়ে এলে যে?

রমেশ বল্‌ল, মায়ের কাছে একটা কথা জিজ্ঞাসা করতে এসেছি।

গৃহিণী বল্‌লেন, এমন কি জরুরী কথা বাবা, যে, দশটার সময় না জিজ্ঞাসা করলেই চল্‌ল না।

রমেশ বল্‌ল, তেমন দরকারী কিছুই নয়। আজ ক'দিন থেকেই কথাটা বল্‌ব বলে' মনে করি; কিন্তু আপনার কাছে যখন আসি,

তখন আর মনে থাকে না। আজ এই একটু আগেই ছোড়-দা'র ঘরে বসে' কথাটা মনে হ'ল, তাই এই অসময়েই এসেছি। মা, আমার কথা শোনবার এখন আপনার সময় হবে ত?

গৃহিণী হেসে বল্লেন, তোমার কথা শোনবার জন্য আমি সব সময়ই প্রস্তুত রমেশ!

রমেশ বল্ল, আচ্ছা মা, এই দেড় বছর কাজ করে' কি আমার পাঁচ শ' টাকা জমে নি?

গৃহিণী বল্লেন, কেন, তুমি কি তোমার টাকার হিসাব রাখ নি।

রমেশ এই কথা শুনে আমার দিকে চেয়ে বল্ল, শুনেছেন বাবু, আমার মায়ের কথা। এমন কথা ত কখনও শুনি নি যে, ছেলে টাকা এনে মায়ের কাছে রাখবে, আর তার হিসাব লিখে রাখবে।

আমি বল্লাম, কেমন, ঠিক জবাব মিলেছে ত।

গৃহিণী হেসে বল্লেন, স্বীকার করছি, কথাটা বলা আমার ঠিক হয় নি। সত্যিই ত, মায়ের কাছে ছেলে টাকা এনে দেবে, তার আবার হিসাব সে রাখতে যাবে কেন? নরেশ পরেশ কতদিন কত টাকা এনে দেয়, তার হিসাব কি তারা রাখে? আমিও হিসাব রাখি না। কিন্তু, তোমার টাকার হিসাব আমাকে রাখতে হয়েছে। কেন, তা' শুন্‌বে? তোমার ঐ পাঁচ শ' টাকা জমাবার খেয়ালের জন্য। তোমাকে সেই হিসাবের খাতা এনে দেখাব বাবা।

রমেশ বল্ল, মা, আপনার আজ কি হয়েছে? আমি কি হিসাব দেখতে চেয়েছি; আমি শুধু জিজ্ঞাসা করছিলাম, পাঁচ শ' টাকা কি এই দেড় বছরে জমে নাই?

গৃহিণী বল্লেন, আমি প্রতি মাসেই একবার করে' হিসাব করি

কেন, তা' জান। তুমি যে বলেছিলে বাবা, তোমার পাঁচ শ' টাকা জমলেই তুমি কাজকর্ম্ম ছেড়ে দিয়ে, আমাদের বন্ধন কাটিয়ে দেশে চলে যাবে; সেই দিন, সেই দুর্দ্দিন কবে আস্‌বে, তারই জন্য প্রতি মাসে হিসাব দেখি। এই বলেই গৃহিণী দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করলেন।

রমেশের মুখ মলিন হ'য়ে গেল। সে যে কি বল্‌বে, তা' ভেবে পেল না।

আমি তখন বল্‌লাম, দেখ, রমেশ প্রথম যখন এসেছিল, তখন ঐ কথা বলেছিল। তখন ওর মনেও হয় নি যে, ও এমন করে' আমাদের স্নেহের বাঁধনে আটকে পড়বে। এখন আর ওর মনে সে ভাব নেই। তবে এ হ'তে পারে যে, পাঁচ শ' টাকা জমলে ও আর কম্পোজিটরী করবে না; তাই বলে' ও যে আমাদের ছেড়ে চলে' যাবে, এ কথা ওর মনে নেই, কেমন রমেশ?

রমেশ অতি মলিন মুখে বল্‌ল, আপনি ঠিক বলেছেন, আপনাদের মায়া কাটিয়ে যাওয়া আমার পক্ষে অসম্ভব হয়েছে। কিন্তু আমি যে উদ্দেশ্য নিয়ে চাকুরী করতে এসেছিলাম সে কথা শুন্‌লে আপনিই আমার কথা সমর্থন করবেন। আচ্ছা মা, আমি স্বীকার করছি, আপনাদের ছেড়ে আমি যাব না; আপনাদের সেবাতেই আমি জীবন কাটিয়ে দেব। কিন্তু, আপনি বলুন, কত টাকা আপনার কাছে আমার মাইনের হিসাবে জমেছে। তারপর, এতদিন যে কথা বলি নি, তা' আপনাদের কাছে বল্‌ব। পাঁচ শ' টাকা জমলে আর কোন কথা গোপন রাখবার আমার দরকার হবে না।

গৃহিণী বল্‌লেন, তা' হ'লে হিসাবটা নিয়ে আসি। তোমাকে দেখাবার জন্য নয় রমেশ, বাবুকে দেখাবার জন্য। এই বলে' গৃহিণী

সে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন এবং একটু পরেই একখানি খাতা এনে আমার হাতে দিয়ে বল্‌লেন, তুমিই রমেশকে শুনিয়ে দেও, তার হিসাবে কত টাকা জমেছে।

আমি খাতা খুলে বল্‌লাম, আগাগোড়া পড়ব না কি?

গৃহিণী বল্‌লেন, অমন কর্ম্মও কোরো না; তা' হ'লে রমেশ মনে ব্যথা পাবে। আমি বুঝতে না পেরে একবার তার মনে ব্যথা দিয়েছি, তুমি আর তা' করো না।

আমি বল্‌লাম, রমেশ, এই খাতায় যে হিসাব লেখা আছে, তাতে আজ পর্য্যন্ত পাঁচ শ' তিয়াত্তর টাকা সাড়ে ন' আনা জমা হয়েছে।

রমেশ বল্‌ল, অত আনা পাই আমি শুন্‌তে চাই নি বাবু! পাঁচ শ' টাকা হয়েছে, এই আমি শুন্‌তে চেয়েছিলাম। এখন আমার কথা বলি। এই দেড় বছর বলি নি কেন, জানেন মা? আমার বিশ্বাস, কোন সঙ্কল্প করে' তা' যদি গোড়াতেই প্রকাশ করা যায়, তা' হ'লে সে সঙ্কল্প সিদ্ধ হয় না। এই ভয়েই আমি কথাটা গোপন রেখেছিলাম! তার জন্য কি আপনাদের কম কষ্ট ভোগ করতে হয়েছে। ঐ কথাটা জান্‌বার জন্যই ত ছোড়-দা'কে এত কষ্ট করে' আমলাবেড়ে যেতে হয়েছিল। কিন্তু আমি যে আমার সঙ্কল্পের কথা এক ভগবান ছাড়া কাউকে জানাই নি। তাঁরই কাছে আমার আকুল আগ্রহ জানিয়েছি, তাঁরই কাছে কৃপাভিক্ষা করেছি। আজ আমার সঙ্কল্প সিদ্ধ হয়েছে। পাঁচ শ' টাকা আমার জমেছে। এখন আমার কথা আপনাদের কাছে খুলে বল্‌তে আর কোন আপত্তি নেই। কিন্তু, সুধু আপনাদের কাছে বল্‌লেই চল্‌বে না, সবাইকার সম্মুখে বল্‌তে

হবে। বড়-দা', মেজ-দা', ছোড়-দা', বৌদিরা—সকলেই এই দেড় বছর কত কি ভেবেছেন। তাঁদের সকলের সুমুখে আমি বল্‌তে চাই যে, এখন কি করুতে হবে। রাত যে এগারটা বাজে। আজ নয় মা, কাল সকালে সে কথা হবে।

গৃহিণী আগ্রহ প্রকাশ করে' বল্‌লেন, না রমেশ, রাত এগারটাই বাজুক, আর তিনটাই বাজুক, আজই তোমার অপূর্ব্ব-কাহিনী শুন্‌তে হবে। তুমি বসো, আমি সবাইকে ডেকে আন্‌ছি। এই বলেই তিনি ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন। দশ মিনিটের মধ্যেই সবাই এসে হাজির।

দীনেশ এসে বল্‌ল, বাবা, এত রাত্রে এমন কি ব্যাপার ঘটল যে, বড়-দা'কে পর্য্যন্ত মা ঘুম ভাঙ্গিয়ে তুলে নিয়ে এলেন?

বড়-বৌমা ঠাট্টা করে' বল্‌লেন, ছোট প্রভু, তোমার জ্বালায় আর আমাদের ঘর-সংসার একসঙ্গে করা দায় হয়েছে; তাই বাবা-মা এই নিশি-রাত্রে সকলকে ডেকে পৃথক হবার বন্দোবস্ত করে' দেবেন। তারই জন্য ডাকা হয়েছে।

দীনেশ বল্‌ল, বেশ, বেশ, এ অতি সুন্দর প্রস্তাব। কিন্তু আমি আগে থাকৃতেই বলে' রাখছি, আমি মা-বাবার ভাগে থাক্‌ব না, আমি বড়-বৌদি'র ভাগে যাব।

নরেশ হেসে বল্‌লে, তোর মত অর্ব্বাচীনকে তোর বড়-বৌদি'ই বশে রাখতে পারবে; তোকে সামলানো আর কারও সাধ্য কুলিয়ে উঠবে না। জান মা, ষ্টুপিডের কাণ্ড। রাত হয় ত একটা বেজেছে। ওর খেয়াল হ'ল, তখন চা খাবে। অমনি উঠে দোরগোড়ায় এসে ডাক্‌বে, বড়-বৌদি, শীগ্‌গির ওঠো, বিশেষ দরকার। বেচারী তাড়া-

তাড়ি উঠে দোর খুলে দিয়ে জিজ্ঞাসা করে, এত রাত্রে কি বিশেষ দরকার? ওর কি লজ্জা আছে; অমনি বলে' বস্‌ল, বৌদি', ভারি চা-চেষ্টা পেয়েছে। উনি আর কি করেন, সেই নিশি-রাত্রে চা খাইয়ে তবে নিস্তার। এত আব্দার উনি ছাড়া আর কে সইবেন? আমি কিছু বল্‌তে গেলেই উনি চোক রাঙ্গিয়ে বলে ওঠেন, আমায় যে ও কত ভালবাসে, এ সব তারই নিদর্শন। এ হেন মহাপ্রভুর তাল উনি ছাড়া সামলাবে কে?

দীনেশ বল্‌ল, জান মা, বড় বৌদি' না থাক্‌লে আমার এ বাড়ীতে বাস করাই দায় হ'ত।

আমি হেসে বললাম, ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি, আমার দীনেশ যেন এমনই ভাবে জীবন কাটাতে পারে। যাক্ সে কথা। তোমাদের সকলকে ডেকে আনা হয়েছে কেন, তা' শোন। রমেশ বলেছিল, তার উপার্জ্জনের টাকা যেদিন পাঁচ শ' হবে, সেই দিন ওর এই টাকা জমানোর কারণ বল্‌বে। আজ এইমাত্র আমি ওকে জানিয়ে দিলাম যে, ওর হিসাবে পাঁচ শ' তিয়াত্তর টাকা আর কয়েক আনা জমেছে। তাই রমেশ আজ তার সঙ্কল্পের কাহিনী সকলকে শোনাবে; আর সে কথা সে বাড়ীর সকলকে একসঙ্গে ক'রে বল্‌বে। তাই তোমাদের ডেকে এনেছি। এখন সকলে স্থির হ'য়ে বসো। রমেশ তার কাহিনী বলুক।

দীনেশ এই কথা শুনে লাফিয়ে উঠে বল্‌ল, আচ্ছা ছেলে মা, তোমার এই রমেশচন্দ্র। ওর কাহিনীর গোড়া খুঁজতে আমায় কি কম হায়রাণ হ'তে হয়েছে। কোথায় কল্‌কাতা, আর কোথায় সেই মেদিনীপুর জেলার আমলাবেড়ে। শ্রীমান্ আমাকে সাত ঘাটের

জল খাইয়ে এনে, আজ তাঁর অপূর্ব্ব-কাহিনী নিবেদন করবেন। আচ্ছা বাহাদুর ছেলে তুমি ভাই রমেশচন্দ্র। বেঁচে থাক, এক শ' বছর তোমার পরমায়ু হোক! বাবা, আপনিও আগে থাকতেই আশীর্ব্বাদ করুন। বড়-বৌদি', এই কাহিনী শোনবার পর কিন্তু মিষ্টিমুখ করাতে হবে, সে কথা আগেই বলে' রাখছি।

আমি হেসে বল্‌লাম, বেশ তাই হবে।

দীনেশ বল্‌ল, অতএব, আপনারা সকলে ধীরভাবে উপবেশন করুন। বাবা, আপনি শুয়ে থাকুন। আমার এ আদেশ এই সব আগন্তুকদের উপরই। শ্রীমান্ রমেশচন্দ্র, আর বিলম্ব করো না, রাত এগারটা বেজে গেছে। তোমার কথা আরম্ভ কর।

গৃহিণী বল্‌লেন, দীনেশ, তুমি একটু চুপ করলেই রমেশ কথা বল্‌তে পারে।

দীনেশ বল্‌ল, এই আমি সাট্ আপ্। রমেশ কথা আরম্ভ কর। সকলেই অধীর হয়েছেন।

চোদ্দ

(রমেশের কথা)

কথা ত বল্‌ব মা ; কিন্তু কোন্‌খান থেকে আরম্ভ করব, তাই ভেবে পাচ্ছি নে। আমার বাড়ীর অবস্থা. বাড়ীতে কে আছেন, না আছেন, কি আছে, না আছে, সে সব কথা আর আমাকে বল্‌তে হবে না ; ছোড়-দা' আমলাবেড়ে গিয়ে সে সবই দেখে-শুনে এসেছেন। আমি যে ভদ্রলোকের ছেলে নই, চাষার ঘরে জন্মেছি, আমার বাবা যে নিজের হাতে চাষ করতেন, আর সেই চাষ-বাসই যে আমাদের ভরণপোষণের একমাত্র সম্বল ছিল, সে কথাও ছোড়-দা' জেনে এসেছেন।

জানেন মা, এই লেখাপড়া শেখাটা আমাদের পাড়াগাঁয়ে, আমাদের মত অবস্থার মাহিষ্যদের মধ্যে চলন এক-রকম ছিল না বল্‌লেই হয়। আমাদের গ্রামে কোন স্কুল বা পাঠশালা ছিল না, এখনও নেই। আমাদের আমলাবেড়ে থেকে দেড় ক্রোশ দূরে রতনপুর নামে একটা গ্রাম আছে। সেখানে অনেক ব্রাহ্মণ-কায়স্থের বাস। তাঁদের অবস্থাও নিতান্ত মন্দ নয়। রতনপুরে মাহিষ্য যাঁরা আছেন, তাঁদের মধ্যে বেশ ভাল অবস্থার লোকও পাঁচ-সাত ঘর আছেন। সেইজন্য সেখানকার ছেলেদের লেখাপড়া শেখবার জন্য একটা লোয়ার প্রাইমারী স্কুল হয়েছিল ; এখন সেটা আপার প্রাইমারী হয়েছে।

উৎস

আমার বাবাকে নানা কাজ উপলক্ষে রতনপুরে প্রায়ই যেতে হোতো। আমাদের কুটুম্বও দুই-চার ঘর সেখানে আছেন। তাঁদের ছেলেরা স্কুলে পড়ে দেখেই বোধ হয় বাবারও ইচ্ছে হয়েছিল আমাকে একটু লেখাপড়া শেখান। তাই তিনি আমাকে রতনপুরের স্কুলে ভর্ত্তি করে' দেন। তিনি রতনপুরেই এক কুটুম্বের বাড়ীতে আমার থাক্‌বার ব্যবস্থা করেছিলেন। তখন আমার বয়স সাত বৎসর। প্রত্যহ তিন মাইল পথ যাওয়া-আসা করা আমার পক্ষে অসম্ভব বলেই বাবা এই ব্যবস্থা করেছিলেন।

দুই বছরের বেশী রতনপুরের স্কুলেই পড়েছিলাম। বাবা প্রায়ই আমাকে দেখতে যেতেন, আর সেখানে শুন্‌তেন আমার মত বুদ্ধিমান ছাত্র না কি সে স্কুলে আর নাই। রতনপুরের অনেকেই বাবাকে বল্‌তেন, তিনি যেন ঐ প্রাইমারী পর্য্যন্ত পড়িয়েই আমার বিদ্যা শেষ না করেন, আমাকে ভাল করে' লেখাপড়া শেখান। আমারও সেই ইচ্ছাই ছিল; কিন্তু বাবাকে কোনদিন সে কথা আমি বলি নি।

এই সময় একদিন মেদিনীপুরের হরেন্দ্রবাবু রতনপুরে তাঁর এক আত্মীয়ের বাড়ী কয়েক দিনের জন্য আসেন। আমার বাবাও সেই সময় সেখানে ছিলেন। বাবার সঙ্গে হরেন্দ্রবাবুর পরিচয় হয়।

তবে জানেন কি মা, হরেন্দ্রবাবু হলেন লেখাপড়া-জানা ভদ্র-লোক, কায়স্থ, মেদিনীপুরের একজন সম্ভ্রান্ত লোক; আর আমার বাবা আমলাবেড়ের এক চাষা, লেখাপড়া জানেন না। এ দুইজনের মধ্যে বন্ধুত্ব জন্মান হতে পারে না—অবস্থাই যে অন্য রকম। কিন্তু আমার বাবা বলেই বলছি নে; আমার বাবা লেখাপড়া জান্‌তেন না, নিজ হাতে চাষই না হয় করতেন; কিন্তু লেখাপড়া জানা ভদ্র-

লোকের সঙ্গে কি ভাবে কথাবার্ত্তা বল্‌তে হয়, তা' জানতেন। আর, আপনারা ত হরেন্দ্রবাবুকে ভালমতই জানেন। তাঁর কাছে ছোট-বড়, ধনী-দরিদ্রের ভেদ নাই। অমন লোক বড়-একটা দেখতে পাওয়া যায় না। তাই দুই-তিনদিনের আলাপেই তিনি বাবাকে চিনতে পেরেছিলেন। আমার বাবা বলে বল্‌ছি নে, সত্যি-সত্যি আমার বাবার চরিত্র-গুণে তিনি আমাদের অঞ্চলের সকলেরই বিশেষ শ্রদ্ধার পাত্র ছিলেন। লেখাপড়া না শিখেও যে লোকে মহৎ হ'তে পারে, ধার্ম্মিক হ'তে পারে, জ্ঞানবান হ'তে পারে, আমার বাবা, আমার পূজনীয় পিতৃদেব তার দৃষ্টান্তস্থল।

আমার কথায় বাধা দিয়ে বড়-দাদা বলে উঠলেন, আর তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ তুমি শ্রীমান্ রমেশচন্দ্র। এমন বাপ না হ'লে কি তাঁর এমন ছেলে জন্মে।

আমি বললাম, বড়-দা', আপনি যদি এমন করে' বাধা দেন, তা' হ'লে কিন্তু আমিও বেশী কথা বলব।

মা বল্‌লেন, না, না, কেউ আর কিছু বল্‌বে না। তবে নরেশ যা' বলেছে, ও কথা আমাদের সকলেরই মনে হয়েছিল। নরেশ সত্যি কথাই বলেছে, এমন বাপ না হ'লে কি এমন ছেলে হয়। যাক্ সে কথা, তুমি তোমার জীবন-কথা বল। শুনতে বড়ই ভাল লাগছে। আর দেখছ না, দীনেশটা যে এমন ছট্‌ফটে, সেও একমনে তোমার কথা শুনছে। এখন তুমি তোমার কথা বল রমেশ!

আমি আবার বলতে আরম্ভ করলাম। হরেন্দ্রবাবু রতনপুরের অনেকের কাছেই আমার প্রশংসা শুনেছিলেন। তিনি যে বাড়ীতে গিয়েছিলেন, সে বাড়ীর কর্ত্তা হরিশবাবু তাঁকে আমাদের সুমুখেই

বলেছিলেন, এই ছেলেটিকে যদি কেউ আশ্রয় দিয়ে লেখাপড়া শেখায়, তা' হ'লে একদিন এ দেশের মুখ উজ্জ্বল করতে পারবে।

বলেছি ত, হরেন্দ্রবাবুর মত মহাশয় লোক আমি খুব কমই দেখেছি। আমাকে আশ্রয় দিয়েছিলেন বলেই তাঁর প্রশংসা করছি নে—আপনারা ত তাঁকে জানেন—এমন লোক আর হয় না, কেমন মা ?

মা বললেন, অতি ঠিক কথা রমেশ ! আমাদের সঙ্গে তাই তাঁর এত আত্মীয়তা।

আমি বললাম, হরেন্দ্রবাবু যে আমাদের বাবুরই মত। তাই দু'-জনে এত আত্মীয়তা। যাক্ সে কথা। হরিশবাবুর কথা শুনে হরেন্দ্রবাবু অমনি বলে' বসলেন, দাসের-পোর যদি আপত্তি না থাকে, তা' হ'লে এখানকার পড়া শেষ হলে আমি রমেশের লেখাপড়া শেখবার সব ভার নিতে পারি। দাসের-পোকে এক পয়সাও খরচ দিতে হবে না। ছেলেটিকে দেখেই আমার মনে ধরেছে। আচ্ছা মা, আপনি বলুন ত, আমাকে আপনারা এত ভালবাসেন কেন ? হরেন্দ্রবাবুই বা আমার মত চাষার ছেলেকে, বলতে গেলে, কোলে তুলে নিলেন কেন ?

বাবু বললেন, রমেশ, সে কথা আর একদিন তোমাকে বুঝিয়ে দেব। আজ আর সে প্রশ্নের উত্তর দেব না। তুমি তোমার কথা বল।

আমি আবার আরম্ভ করলাম। দেখুন মা, ক্রমেই কথা বেড়ে যাচ্ছে, এদিকে রাতও অনেক হ'ল; আজ আর কাজ নেই গল্প করে।

বড়-বৌদি' এতক্ষণ চুপ করে ছিলেন। তিনি বল্‌লেন, কি আর রাত হয়েছে, এখনও বারোটা বাজে নি। আচ্ছা, তুমি বারোটা পর্য্যন্ত বল। তারপর না হয়, আজকের মত শেষ কোরো।

বেশ তাই হবে। রতনপুরে তারপর বোধ হয় ছয় সাতমাস ছিলাম। প্রাইমারী পরীক্ষায় সকলের উপর হয়ে পাশ করেছিলাম। তারপরই বাবা আমাকে মেদিনীপুরে নিয়ে গিয়ে হরেন্দ্রবাবুর বাসায় রেখে এলেন। আমি মেদিনীপুরের বাঙলা বিত্থালয়ে ভর্ত্তি হলাম।

স্কুলের পড়া আর কতটুকু। সে পড়া শিখতে আমার এক ঘণ্টার বেশী সময় কোন দিনই লাগত না। বাকী সময়টা আমি হরেন্দ্রবাবুর ছাপাখানায় কাটাতাম; খেলা করতে, কি বেড়াতে যেতাম না। এমনি করে' ইস্কুলের পড়াও হোতো, ছাপাখানার কম্পোজিটারীও শেখা হোতো। ঐটে শিখেছিলাম বলেই ত আজ আপনাদের পেয়েছি; নইলে যে দিনকাল পড়েছে, বি-এ, এম-এ-রাই গলিতে গলিতে ফিরছে, আমার মত বাঙলা ছাত্রবৃত্তি পাশ করা ছেলে ট্রামের চালকগিরি কাজও পায় না। কেমন মা?

মা বল্‌লেন, সে কথা ঠিকই।

যাক্‌ সে কথা। হরেন্দ্রবাবুর বাড়ীতে আমি সাত বৎসর ছিলাম। আমি একবারে তাঁদের ঘরের ছেলে হয়ে গিয়েছিলাম। তাঁরা যে কায়স্থ, আর আমি যে মাহিষ্য, এ কথা আমরা ভুলেই গিয়েছিলাম। ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষা দিতে আমার সাত বছর লেগেছিল। একে চাষার ছেলে, কোন পুরুষে মা সরস্বতীর ছায়াও কেউ মাড়ায় নাই; তারপর রতনপুরে যা' পড়েছিলাম, সে অতি সামান্য; কাজে-কাজেই অতদিন লাগল ছোড়-দা', আপনি ভাবছেন বুঝি আমি এক ক্লাসে তিন

বছর কাটিয়েছি। তা' নয় কিন্তু। আমাকে যে একেবারে সকলের নীচের ক্লাসে ভর্ত্তি করেছিল। তাই সাত বছর লেগেছিল।

নাঃ, আর কথা বাড়াবো না। ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষা হ'য়ে গেল। মাষ্টার মহাশয়েরা বল্‌লেন, এক মাসের মধ্যেই পরীক্ষার ফল বা'র হবে। আমি মনে করলাম, পরীক্ষার কি ফল হয় তাই জেনে তবে বাড়ী যাব ; যদি পাশ করি, তবেই বাড়ী গিয়ে বাবা, মা, দিদিকে প্রণাম করব। আর যদি ফেল করি, তা' হ'লে কেমন করে' বাড়ী গিয়ে মুখ দেখাব। এই ভেবে মেদিনীপুরেই থাক্‌লাম।

কিন্তু, মানুষে ভাবে এক, বিধাতা করেন আর এক। আমি ঠিক করেছিলাম, পরীক্ষার ফল জেনে বাড়ী যাব, আর বিধাতা খবর এনে দিলেন, বাবার খুব অসুখ, সংবাদ পাওয়া মাত্র আমাকে বাড়ী যেতে হবে। সেই দিনই আমি উর্দ্ধশ্বাসে, কত অমঙ্গলের কথা ভাবতে ভাবতে বাড়ী রওনা হ'লাম।

বড়-বৌদি', ঐ শুনুন, বারোটা বাজছে। আজ এইখানেই শেষ।

ছোড়-দা' বলে' উঠ্‌লেন, ওরে মূর্খ, ঐ রকম করে' বুঝি বল্‌তে হয় ; বল্—এইখানেই বেদব্যাসের বিশ্রাম।

সবাই হো হো করে' হেসে উঠলেন। বড়দা' বল্‌লেন, কাল রবিবার। কাল দুপুরে কেউ ঘুমুতে পারবে না। খাওয়া-দাওয়ার পরই বেদব্যাসের কথা আরম্ভ হবে।

ছোড়দা' বল্‌লেন, তথাস্তু ! বড়-বৌদি', এক পেয়ালা চা এখন না হ'লে 'রমেশচন্দ্রের কথা অমৃত সমান' হজম হবে না।

বড়-বৌদি' বল্‌লেন. সে আমি জানি। চল আমার ঘরে।

সে রাত্রির মত আমাদের সভা ভঙ্গ হ'ল।

পনর

পরদিন রবিবার। কারও অফিস, আদালত, স্কুল নেই। আমি যে সামান্য কম্পোজিটর, আমারও রবিবারে ছুটী। আমাকে কিন্তু মধ্যে মধ্যে রবিবারেও প্রেসে বেরুতে হয়। যখন প্রেসে কাজের খুব চাপ পড়ে, তখন শনিবারেই ম্যানেজার বাবু আমাদের কয়েকজন কম্পোজিটরকে ডেকে পরের দিন বেরুতে বলেন। তাতে আমাদের লাভ বই লোকসান নেই। রবিবার, কি ছুটীর দিন প্রেসে কাজ করতে বেরুলে আমরা ডবল রোজ পাই; অর্থাৎ, দুই দিনের মাইনে পাই। এ রবিবারে আর প্রেসে যেতে হবে না।

এদিকে এ-বাড়ীর একটা নিয়ম এই যে, হপ্তার ছয় দিন দিনের বেলায় কাউকে সাড়ে আটটায়, কাউকে ন'টায়, কাউকে দশটায় কাজে বেরুতে হয়; কাজেই খাওয়া-দাওয়া অতি তাড়াতাড়ি সারতে হয়; উড়িষ্যা-গৌরব, অজ্ঞাত-কুলশীল, বামুন নামে পরিচিত ব্যক্তি যা' তা' রেঁধে দেয়; তাই খেয়েই সকলকে বেরুতে হয়। অত সকালে মা, কি বৌদিদিরা সব দিন রান্নায় যোগ দিতে পারেন না। কিন্তু রবিবারের ব্যবস্থা একেবারে আলাদা। সেদিন বামুন ঠাকুরের বলতে গেলে এক রকম ছুটী; তাকে বিশেষ কিছু করতে হয় না; মা ও বৌদিদিরাই সেদিন দুই বেলা রান্না করেন। সুতরাং, রবিবারে

যে রান্নার আয়োজন বেশীই হয়, তা' না বল্‌লেও চলে। কাজেই রান্না শেষ হ'তে বেশী বেলা হয়ে যায়। রবিবারে আমাদের সকলেরই আহার করতে একটা-দেড়টা বেজে যায়। বাবুর আদেশ আছে, রবিবারের মধ্যাহ্ন-ভোজন সবাইকে একসঙ্গে করতে হবে। ছোড়-দা' সেদিন বারোটার কমে নাইতেই নামেন না; বড়-দা', মেজদা'রও প্রায় তাই। কারও যেন উঠতে ইচ্ছে করে না। ছোড়-দা' রবিবার সকাল থেকে আরম্ভ করে' আহারে বস্‌বার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত আরও না হয় পাঁচ পেয়ালা চা খাবেনই। মা কত নিষেধ করেন, কিন্তু কে শোনে সে কথা! বড়-বৌদিদি যে চার সপক্ষে—ছোড়-দা যতবার চা চাইবেন, বড়-বৌদিদি সব কাজ ফেলে, আগে ছোড়-দা'র চা তৈরী করে' দেবেন। মা এক-একদিন বলেন, বড়-বৌমা, তোমার ঘর থেকে আমি চায়ের সব সরঞ্জাম নিয়ে নর্দ্দমায় ফেলে দেব কিন্তু। বড়-বৌদিদি বলেন, তা হ'লে আপনার ছেলে আমাকে বাড়ী-ছাড়া করবে। ওর আব্‌দার মা, আমার বড় ভাল লাগে। মা কি করবেন চুপ করে' যান।

যাক্ সে কথা। রবিবারে আমাদের খাওয়া শেষ হ'তে দেড়টা বাজল। খেতে বসেই ছোড়-দা' বল্‌লেন, বৌদি', কালকের রাত্রির কথা মনে আছে ত। বড়-দা' বলেছেন, আজ খাওয়া-দাওয়ার পর কেউ বিশ্রাম করতে পারবে না, সবাইকে বাবার ঘরে হাজির হ'তে হবে। সেখানে রমেশচন্দ্রের মহাভারতের কথা আজ শেষ হবে। তোমরা যে সেই বেলা তিনটা পর্য্যন্ত বসে' বসে' গল্প করবে আর খাবে, সে আজ আর হচ্ছে না—কেমন বড়-দা' ?

বড়-দা' হেসে বল্‌লেন, তা হ'লে ওদের আজ অনাহারেই

থাকতে হবে দেখছি। তুই যে রকম তাড়াতাড়ি এখন থেকেই আরম্ভ করলি, তাতে বেচারীরা অতিষ্ঠ হয়ে পড়বে।

বাবু বল্লেন, তা' বৌমা, তোমরা আজ একটু শীগগির করেই সব শেষ করে' এস না। দীনেশ যখন ধরেছে, তখন তোমরা বিলম্ব করলে ওর তাড়ায় সবাইকে অস্থির হ'তে হবে।

মা বল্লেন, তা হ'লে আমরা এ বেলা না হয় নাই খেলাম। আমরা যে খাবার সময় দুটো সুখ-দুঃখের কথা বলি,ঘর-গেরস্থালীর কথা বলি।

ছোড়-দা' বল্লেন, আহা, এক দিন না হয় সে মামুলী আলোচনা বন্ধই থাক্ না।

বড়-বৌদিদি বল্লেন, বেশ, তাই হবে। এখন দেড়টা বেজেছে ত। আমরা ঠিক কাঁটায় কাঁটায় সওয়া দু'টায় বাবার ঘরে হাজির হব। কেমন মা?

মা বল্লেন, বেশ তাই হবে।

যে কথা, সেই কাজ। ঠিক সওয়া দুইটার সময় সবাই বাবুর ঘরে হাজির। বাবু কোন দিনই দিনে ঘুমান না; খেয়ে উঠেই বই নিয়ে বসেন। আজ আর বইও হাতে নিলেন না—ইজিচেয়ারে বসে' প্রতীক্ষা করতে লাগলেন।

তাঁদের এই আগ্রহ দেখে আমার ভারি লজ্জা করতে লাগল। আমার এমন কি কথা, যা' শোনবার জন্য এঁরা এমন আগ্রহান্বিত হয়েছেন। গরীব চাষী গৃহস্থের ছেলের জীবন-কথার মধ্যে এমন কি-ই বা থাকতে পারে, আমি ত ভেবে পেলাম না।

সবাই বাবুর ঘরের মধ্যে এসে যে যেখানে পারলেন বসে' পড়লেন। ছোড়-দা' বল্লেন, শোন রমেশচন্দ্র, এই মাসিক-পত্রগুলোর

ক্রমশঃ প্রকাশ্য উপন্যাসগুলো দেখলেই পাতা উল্‌টিয়ে যাই। তোমার বেলায় এর একটু ব্যতিক্রম করেছি। কালই রাত্রে কথা শেষ করা উচিত ছিল; অনেক রাত্রি হয়েছে বলে' 'ক্রমশঃ প্রকাশ্য' সহ্য করেছি। আজ তাড়াতাড়ি বলে' ফেল, আমার কথাটি ফুরালো, নটে গাছটি মুড়ালো। তুমিও অব্যাহতি পাও, আমরাও পাঁচ শ' টাকার রহস্যটা জেনে ফেলি।

বড়-দা' বল্‌লেন, এই দেখ্‌ দীনেশ, তুই-ই ত বক্তৃতা আরম্ভ করে' সময় নষ্ট করিস। তুই চুপ কর্‌ না ভাই।

ছোড়-দা' বল্‌লেন, আগাগোড়া চুপ করে' থাকব কি করে', আমি যে প্রত্যক্ষদর্শী; অর্থাৎ, স্পেশাল করেস্‌পন্‌ডেণ্ট। মা যে আমাকে সরেজমিনে তদন্ত করতে পাঠিয়েছিলেন; সুতরাং, রমেশের কথার দু'-চারটে ব্যাখ্যা আমি না করলে তোমরা আমলাবেড়ের কি বুঝবে?

বড়-দা' বল্‌লেন, তা' যখন দরকার হবে করিস্‌, এখন চুপ কর্‌।

সকলেই যখন চুপ করলেন, তখন আমার কথা আরম্ভ করার দরকার।

আমি বল্‌লাম, মা, আমার কথা শোন্‌বার জন্য আপনারা যে এত আগ্রহ প্রকাশ কর্‌ছেন, এতে আমার লজ্জা বোধ হচ্ছে। কিন্তু, না বলে' উপায় নেই।

বাবার ভয়ানক অসুখের কথা শুনে আমি তখনই মেদিনীপুর থেকে বাড়ী যাত্রা করলাম। পথে কোথাও একটুকুও অপেক্ষা করি নাই। প্রাতে আটটায় সময় সংবাদ পেয়ে তখনই রওনা হয়ে বেলা এগারটার সময় ছয় কোশ পথ চলে' বাড়ী পৌঁছলাম।

তাড়াতাড়ি বাবার কাছে যেতেই তিনি অতি কাতর স্বরে

বল্‌লেন, বাবা রমেশ, এসেছ। এতক্ষণও যে আমার প্রাণ বের হয় নি, সে কেবল তোমাকে একবার শেষ দেখার জন্য।

দিদি বাবার পায়ের কাছে বসেছিলেন ; তিনি বল্‌লেন, বাবা, আপনি অমন করছেন কেন ? কবিরাজ যে বলে' গেলেন, আজ আপনার জ্বর একটু কমেছে, ভালোর দিকে গিয়েছে ; দুই-চার দিনের মধ্যেই জ্বর সেরে যাবে।

বাবা ধীরে ধীরে বল্‌লেন, জ্বর যে যাবে না, তা' আমি বুঝেছি মা। আমার শরীর ক্রমেই অবশ হয়ে আস্‌ছে ; আমি কথা বল্‌তে পারছি নে।

আমি বল্‌লাম, বাবা, আপনি কথা বল্‌বেন না ; চুপ করে শুয়ে থাকুন। তারপর দিদির দিকে চেয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, বাবা এমন কাতর হয়ে পড়েছেন, আর তোমরা দু'দিন আগে আমাকে সংবাদ দাও নি।

দিদি বল্‌লেন, আমরা ত সংবাদ দিতে চেয়েছিলাম ; বাবা নিষেধ করলেন। কাল বল্‌লেন তোমাকে সংবাদ দিতে। কবিরাজ বিশেষ করে' বলে' গিয়েছেন, আমাদের পুকুরের জল যেন বাবাকে খেতে না দেওয়া হয়, ও জল না কি খুব খারাপ হয়েছে। আমি এত-ক্ষণ বাবাকে ছেড়ে উঠতে পারি নি। তুমি বাবার কাছে বোসো ; আমি বাঁধ থেকে ভাল জল নিয়ে আসি।

আমি বল্‌লাম, এত বেলায়, এই বশেখ মাসের রৌদ্রের মধ্যে বাঁধে যাবে কি করে' ? সে ত কম দূর নয়—প্রায় এক মাইল পথ। এখন না গেলে হয় না ? বিকেলে জল আন্‌লেই হবে।

দিদি বল্‌লেন, না, না রমেশ, কবিরাজমশায় বারবার করে বলে

গিয়েছেন, আমাদের পুকুরের জল যেন বাবাকে খেতে না দেওয়া হয়। তুমি একটু বাবার কাছে বোসো ; আমি যাব আর আস্‌ব। এর মধ্যে যদি বাবার তেষ্টা পায়, তা' হ'লে মাইতিদের বাড়ী থেকে এক ঘটি জল এনে বাবাকে খাইও। বাবা কিন্তু বারবার জল খেতে চাইবেন। এই বলেই দিদি কলসী নিয়ে বাঁধের পথে চলে' গেলেন।

একটু পরেই বাবা বল্‌লেন, বাবা রমেশ, আমার পিপাসায় বুক ফেটে যাচ্ছে ; ভাল দেখে একটু ঠাণ্ডা জল আমাকে খেতে দাও।

আমি তখন মাকে ডেকে মাইতিদের বাড়ী থেকে এক ঘটি জল আন্‌তে বললাম। তিনি তখনই আমাদের প্রতিবেশী মাইতিদের বাড়ী গিয়ে জল নিয়ে এসে বললেন, এ ভাল জল। ও বাড়ীর ছোট-বৌ এই এখনই বাঁধ থেকে এই জল নিয়ে এসেছে।

আমি একটা গ্লাসে সেই জল ঢেলে বাবাকে খেতে দিলাম। তিনি এক চুমুক জল খেয়েই বললেন, এ যে গরম জল। ওরে, আমাকে একটু ঠাণ্ডা জল দে—আমার বুক ফেটে যাচ্ছে !

কোথায় তখন ঠাণ্ডা জল পাব। ঘরে যে জল আছে, সে ত আমাদের পুকুরের জল। সে জল যে কবিরাজ দিতে নিষেধ করেছেন।

বাবা আবার অতি ক্ষীণস্বরে বল্‌লেন, দে বাবা, আমাকে একটু শীতল জল—আমি যে মরে গেলাম পিপাসায় !

তখন আর কি করি : আমাদের ঘরে যে জল ছিল, তাই একটু এনে বাবার মুখে দিলাম। তিনি সে জল এক চুমুক খেয়েই যেন কেমন করে উঠলেন ; সঙ্গে-সঙ্গেই সমস্ত জল বমন হয়ে গেল।

বাবা তখন এমন অসাড় হয়ে পড়লেন যে. দেখে আমার ভয় হ'ল। আমি ডাক্‌লাম, বাবা, অমন করছেন কেন ?

তিনি আমার দিকে চেয়ে কি যেন বল্‌তে চেষ্টা করলেন। আমি বললাম, আপনি কথা বল্‌বেন না।

বাবার তখনও বোধ হয় জ্ঞান ছিল ; আমার কথাও বোধ হয় শুন্‌তে পেয়েছিলেন। তিনি অতি কাতরভাবে বল্‌লেন, 'একটু ঠাণ্ডা জল!' আর কোন কথাই তাঁর মুখ দিয়ে বের হ'ল না ; ঐ 'একটু ঠাণ্ডা জল'ই তাঁর শেষ কথা!

তাঁর ঐ অবস্থা দেখে আমি চেঁচিয়ে উঠলাম। মা বাইরে ছিলেন ; তিনি ঘরের মধ্যে এসেই কেঁদে উঠলেন। সেই কান্না শুনে প্রতিবেশীরা ছুটে এলেন। মাইতি-জ্যেঠা বল্‌লেন, আর কেন, শেষ কাজ কর। ঘরের মধ্যে রেখে কাজ নেই, উঠানে নিয়ে চল।

তারপর আর কি। সবাই ধরাধরি করে' বাবাকে বাইরে আন্‌তেই তাঁর প্রাণ বেরিয়ে গেল। সকলে চীৎকার করতে লাগল। আমার কিন্তু তখন কান্না এলো না—আমার কাণে বাবার সেই শেষ কথা বাজতে লাগল—'একটু ঠাণ্ডা জল!'

সন্ধ্যার পূর্ব্বেই বাবার মৃতদেহ নিয়ে আমরা সেই এক মাইল দূরে বাঁধের ধারে শ্মশানে উপস্থিত হলাম। আমি যন্ত্র-চালিতের মত যা' যা' করতে হয় করলাম। চিতা যখন জ্বলে উঠল, আমি তখন আর সেখানে বসে' থাকতে পারলাম না, একটু দূরে গিয়ে বাঁধের কিনারায় বস্‌লাম।

একদিকে চিতা জ্বলে উঠল, আর একদিকে সূর্য্যদেব অস্ত যেতে লাগলেন। আমি তখন সেই লোহিতবরণ অস্তগামী সূর্য্যদেবকে সাক্ষী রেখে প্রতিজ্ঞা করলাম, যদি আমি বেঁচে থাকি, তা' হ'লে গ্রামের এই জলকষ্ট দূর করব—ঠাণ্ডা জল দিয়ে আমার পিতৃদেবের

তর্পণ একদিন করব। মা গো, সেই প্রতিজ্ঞা-পালনের জন্যই আমি দেশ ছেড়ে, মা-দিদিকে ছেড়ে, চাকরী করতে এখানে এসেছি। আমার এমন শক্তি হবে না, এত উপার্জ্জনক্ষম আমি কোনদিনই হতে পারব না যে, হাজার-দেড়হাজার টাকা খরচ করে' গ্রামে একটা ভাল জলের পুকুর কাটাতে পারি। সেই দিনই রাত্রে ঠিক করলাম যে, আমি আমার বাড়ীতে একটা টিউব-ওয়েল বসাব। মেদিনীপুরে দেখেছিলাম, চার শ' টাকাতেই টিউবওয়েল হয়। আমাদের গ্রামে, আমার বাড়ীতে একটা টিউব-ওয়েল করতে আর না হয় একশ' টাকাই বেশী লাগবে। এই পাঁচ শ' টাকা যে করে' হোক আমাকে সংগ্রহ করতে হবে—নিজের দেহপাত করে' এই পাঁচ শ' টাকা আমাকে জমাতে হবে। সেই টাকা দিয়ে বাড়ীতে একটা টিউব-ওয়েল করে,' তারই জলে প্রথম আমার পিতৃদেবের তর্পণ করবো—তাঁর ঠাণ্ডা জলের তৃষ্ণা নিবারণ করব। তারপর আমি যে চাষার ছেলে তাই হব—চাষ করে' জীবন কাটাব। মা, আমার সেই প্রতিজ্ঞা-পূরণের সময় হয়েছে—পাঁচ শ' টাকা আমি উপার্জ্জন করেছি। এইবার আমার ছুটী। আমি বাড়ী গিয়ে টিউব-ওয়েল বসাই—আমার ব্রত শেষ হোক। আমি ঘরে ফিরে—

আমার কথা শেষ করতে না দিয়েই মা আমাকে তাঁর বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরে' হা হা করে' কেঁদে উঠলেন। বাবু উঠে এসে আমার পাশে বসে' অশ্রুপূর্ণ চোখে বল্লেন, ধন্য রমেশ, ধন্য তোমার প্রতিজ্ঞা! ধন্য তোমার সাধনা!

আমি তাঁর পদধূলি গ্রহণ করে' মায়ের সেই সর্ব্বমঙ্গলময়ী বুকে মাথা দিয়ে কি যে শান্তিলাভ করলাম, সে কথা কেমন করে' বোঝাব।

ষোলো

(যোগেন্দ্রবাবুর কথা)

রমেশের কথাগুলো শুনে আমরা সকলে একেবারে মুগ্ধ হয়ে গেলাম। এ কি ছেলে? গরীব মাহিষ্য কৃষকের ছেলে; লেখাপড়া আর বেশী কি করেছে, মেদিনীপুরের বাঙ্গালা স্কুল থেকে ছাত্রবৃত্তি পাশ করেছে। কি তার পিতৃভক্তি! কি তার প্রতিজ্ঞার বল! কি তার মহৎ হৃদয়! আমার বয়স এই পঁয়ষট্টি বৎসর। এই বয়সে চাকুরী উপলক্ষে বাঙ্গালা, বিহার, উড়িষ্যার অনেক স্থানে যেতে হয়েছে; অনেক লোকের সঙ্গে পরিচয় হয়েছে; অনেক বিদ্বান, বুদ্ধিমান, ধনী, মানী লোকের সংসর্গে এসেছি! অনেক গরীব দুঃখীকেও দেখেছি;—কিন্তু, আমি বল্‌তে পারি, এই রমেশের মত ছেলে আমি কোথাও দেখি নি। যাদের আমরা সামান্য চাষা বলে' উপেক্ষা করি, তারা যেন মানুষের মধ্যেই নয় বলে' মনে করি, সেই কৃষকের ঘরে এই রমেশের জন্ম; কিন্তু, ওর কথা শুনে, ওর চরিত্র আলোচনা করে' আমি দশ মুখে ওর প্রশংসা করেছি। আজ আমি বলতে পারি, বিদ্যা, বুদ্ধি, আভিজাত্য কিছুই কিছু নয়; মানুষ হ'তে হ'লে ও-সবের বড়-একটা দরকার হয় না। চাই হৃদয়! আর চাই ভগবানের কৃপা!

আমি এই সব কথা কতক্ষণ ভাবছিলাম, বল্‌তে পারি না;

হঠাৎ আমার বড় ছেলে নরেশের কথায় আমার চিন্তার সূত্র ছিঁড়ে গেল। নরেশ বল্‌ল, মা, শুন্‌লে ত রমেশের কথা। এখন কি করবে বল? · এত স্নেহের বাঁধন দিয়েও কিন্তু তোমার রমেশ ছেলেকে আট্‌কাতে পারলে না মা!

রমেশ বল্‌ল, বড়-দা' যে কি বলেন মা, তার কোন অর্থই নেই। এ বাঁধন কি কাট্‌বার যো আছে? জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত আপনাদের দাসত্ব করলেও এ ঋণের, এ স্নেহের, এ অনুগ্রহের এক কণামাত্রও শোধ করতে পারব না। যেখানেই থাকি, যে অবস্থাতেই পড়ি, দৌড়ে আসব আমি মায়ের অভয় কোলে।

দীনেশ বল্‌ল, তা' ত বুঝলাম, কিন্তু তুমি ষ্টুপিড যে এখানকার কাজ-কর্ম্ম ছেড়ে দিয়ে বাড়ী গিয়ে চাষ করবে বল্‌লে, আমরা তিন ভাই বেঁচে থাক্‌তে সে কিছুতেই হবে না। কেমন বাবা, আমি ঠিক কথা বলি নি।

আমি এতক্ষণ চুপ করেই ছিলাম; ছেলেরা বৌমারা, আর গৃহিণী কি বলেন তাই শুনবার জন্য। দীনেশ যখন সোজা করে' কথাটা বলে' ফেলল, তখন আমি বল্‌লাম, দীনেশের কথাই ঠিক। এ কথায় কেউ আপত্তি করতে পারবে না।

বড়-বৌমা বল্‌লেন, ছোটবাবুর কথার ওপর কথা বল্‌বে, এমন লোক এ বাড়ীতে নেই। কিন্তু আসল কথা ত তা' নয় বাবা, এখন কি করা কর্ত্তব্য, তাই বলুন।

দীনেশ বল্‌ল, করা আবার যাবে কি? এ সোজা কথা। রমেশ বাড়ী যাক্‌। আজ মাঘ মাসের ক'দিন মা? আমার ও-সব বাঙ্গালা তারিখ-টারিক মনে থাকে না।

বড়-বৌমা বল্‌লেন, আজ সাতই মাঘ। কেন, বিয়ের দিন ঠিক করবে না কি ?

দীনেশ বল্‌ল, তোমরা ঐ এক কথাই জান, বিয়ে আর বিয়ে। পৃথিবীতে যেন বিয়ে ছাড়া আর কোন অনুষ্ঠানই নেই। যাক্ গে সে কথা। আমি বলি কি, রমেশ তার পাঁচ শ' টাকা নিয়ে বাড়ী যাক্। ওদের মেদিনীপুরে কে একজন টিউব-ওয়েলের কন্‌ট্রাক্টর আছে। তার সঙ্গে কথাবার্ত্তা বলে' ওদের বাড়ীর উঠানের এক কোণে একটা টিউব-ওয়েল তৈরী করবার ব্যবস্থা করুক। কন্‌ট্রাক্টরকে বিশেষ করে' বলে' দিতে হবে যে, বৈশাখ মাসের গোড়াতেই সব শেষ করে' দিতে হবে। সতেরই বৈশাখ রমেশের বাবা স্বর্গারোহণ করেছিলেন। সেই দিন প্রথম ঐ টিউব-ওয়েলের জল দিয়ে ও পিতৃ-তর্পণ করবে।

আমার গৃহিণী বল্‌লেন, সে ত হবেই। তার জন্য ত ভাবনা নেই ; রমেশই তা' করবে। আমি জিজ্ঞাসা করছি, তোমাদের কি কিছু কর্ত্তব্য নেই।

দীনেশ বলল, খুব আছে মা, খুব আছে। আমি সেদিন কলেজ কামাই করেও আমলাবেড়ে যাব, আর পেট ভরে' খাবো।

বড়-বৌমা বল্‌লেন, তা' হ'লে আমাকেও যে তোমার সঙ্গে যেতে হবে, নইলে এমন অনুষ্ঠান-উপলক্ষে ঘণ্টায় ঘণ্টায় তোমাকে চা খাওয়াবে কে ?

পরেশ বল্‌ল, বাবা, আপনিও শুনুন ; মা, তুমিও শোন। আমার এতদিনের স্কলারসিপের যে টাকা জমা হয়েছে, যার থেকে তোমরা একটি পয়সাও খরচ করতে দাও নি, সেই টাকা দিয়ে রমেশকে একটা

প্রেস্ ক'রে দেওয়া হোক। রমেশ যতই বলুক, ও-সব চাষের কাজ ওকে দিয়ে হবেও না, আমরা করতেও দেব না। কেমন বাবা, আপনি কি বলেন?

দীনেশ বল্‌ল, বা রে কথা! মা যে এতদিন বলে' আসছেন, মেজদা'র মেয়ে হ'লে ঐ টাকা দিয়ে তার গয়না গড়ানো হবে। সে বেচারীকে বঞ্চিত করা কি ঠিক হবে?

গৃহিণী বল্‌লেন, পরেশের যদি মেয়েই হয়, তা' হ'লে ঐ সাড়ে চার হাজার টাকার গহনা আমি তার বিয়ের সময় দেব; তার আগে যদি মরি, তা' হ'লেও উইল করে' দিয়ে যাব।

আমি বল্‌লাম, পরেশের প্রস্তাব আমি অনুমোদন করছি। পরেশ পরেশের মতই কথা বলেছে। এই ত চাই! এই ত চাই!

নরেশ বল্‌ল, এ ত রমেশের কল্‌কাতায় আটকিয়ে রাখবার ব্যবস্থা হল।

বড়-বৌমা বলে' উঠলেন, আর সে ব্যবস্থার বিরুদ্ধে রমেশ একটী কথাও বল্‌তে পারবে না; মেজ-বাবুর এ আদেশ অমান্য করবার শক্তি রমেশের হবে না।

আমি বললাম, পরেশ তার কর্ত্তব্য প্রতিপালন করল, দীনেশ ত সেই সত্তেরই বৈশাখ রমেশের বাড়ী ভোজ খেয়েই তার কর্ত্তব্য শেষ করবে। গিন্নী, তোমার কর্ত্তব্য কি কিছু নেই, বড়-বৌমা কিছু বল্‌বে না। আমি ত এখন অকর্ম্মণ্য। মাসে চারশ টাকা পেন্সন পাই মাত্র; আমি আর কি করতে পারি?

মেজ-বৌমা এতক্ষণ চুপ করে' ছিলেন। এইবার তিনি বল্‌লেন, অমন কথা বল্‌বেন না বাবা! আপনারই ত সব; আপনি যে

কর্ত্তা। আপনি যা আদেশ করবেন, আমরা তাই পালন করব। কেমন মা?

গৃহিণী বল্লেন, সে কথা ঠিক। ওঁর কি ইচ্ছা, তাই বলুন; নরেশ, পরেশ, দীনেশ, তা' মাথা হেঁট করে' পালন করবে।

দীনেশ বল্ল, আর তুমি? তুমি বুঝি কিছু করবে না, মা!

নরেশ বল্ল, মাকেই ত সব করতে হবে। আমরা যে যা উপার্জ্জন করি' সবই ত মায়ের। আমরা যা' করব, সে সব মায়েরই করা হবে।

আমি বল্লাম, তা' হ'লে তোমরা শোন, আমার কি ইচ্ছা হয়েছে। রমেশ তার পিতার স্মৃতি-তর্পণের জন্য তার সঙ্কল্পিত টিউব-ওয়েল করুক। আমরা রমেশের সেই ডোবাটার সংস্কার করে দেব—যে ডোবার বিষাক্ত জল খেয়ে রমেশের পিতার তৃষ্ণা দূর হয় নি।

দীনেশ বল্ল, সংস্কার নয় বাবা, একেবারে সংহার; একেবারে নূতন করে' পুকুর কাটাতে হবে, ঘাট বাঁধিয়ে দিতে হবে। শুন্লে বড়-দা', বাবার কথা। হাজার হোক্ আমার বাবা যে! এই বলে দীনেশ দৌড়ে এসে আমার পায়ের ধূলা নিল। আনন্দে আমার চক্ষু ছলছল করে' এল; আমি দীনেশকে বুকে জড়িয়ে ধরে' প্রাণ খুলে আশীর্ব্বাদ করলাম।

গৃহিণী বল্লেন, এর চাইতে ভাল ব্যবস্থা আর হ'তে পারে না। এই পুকুর কাটাবার ভার দীনেশকে নিতে হবে। ও মেদিনীপুরে গিয়ে শ্রীপতিকে নিয়ে আমলাবেড়ে যাক; জনমজুর ঠিক করে' পুকুরের কাজ আরম্ভ করে' দিয়ে আস্বে। বৈশাখের সতেরই

তারিখে যেমন রমেশের টিউব-ওয়েলের প্রতিষ্ঠা হবে, তেমনি পুষ্করিণীও প্রতিষ্ঠা হবে।

বড়-বৌমা বল্‌লেন, বাবা, মা, আপনারা অনুমতি করুন, এই প্রতিষ্ঠা ব্যাপারে যা' খরচ হবে, তা' সব আমি দেব, সে যত টাকাই হোক না কেন?

দীনেশ বল্‌ল, বড়-বৌদি', তোমার বাবা তোমাকে যে কয় হাজার টাকা দিয়ে গিয়েছেন, তা' যে তুমি এ ভাবে ব্যয় করতে প্রস্তুত হয়েছ, তোমার যে এমন ধর্ম্মে মতি হয়েছে, তার কারণ কি জান? অক্লান্তভাবে এই দীনেশচন্দ্রের সমস্ত আবদার পালনের পুরস্কারস্বরূপ ভগবান তোমাকে এমন সুমতি দিয়েছেন। তা' হ'লে বোঝা গেল যে, সেই সতেরই বৈশাখের দিনকয়েক পূর্ব্বে আমাদের সগোষ্ঠী আমলাবেড়ে যেতে হবে।

গৃহিণী বল্‌লেন, সে ত হবেই, আর তার ব্যবস্থার ভার যখন বড়-বৌমা নিলেন, তখন দীনেশকেই সেনাপতি হ'তে হবে।

দীনেশ লাফিয়ে উঠে বল্‌ল বড়-দা', মেজ-দা', শুন্‌লে ত মায়ের কথা। এম-এই হও, আর এম-এস্-সিই হও, দীনেশের সঙ্গে তোমরা পেরে উঠবে না, যখন মা, আর বড়-বৌদি' আমার সহায়। এবার দেখ্‌ছি বি-এস্-সি একজামিনটা দেওয়া হলো না, ডাক্তার হবার একটা বছর পিছিয়ে গেল। তা' হোক্, কি বল বড়-দা'!

রমেশ অবাক্ হয়ে আমাদের এই সব আলোচনা শুন্‌ছিল, একটী কথাও সে এতক্ষণ বলে নাই। এইবার বল্‌ল, মা, তা' হ'লে আবুহোসেনের গল্পটা সত্যিই!

গৃহিণী বল্‌লেন, বাবা রমেশ, যার কাজ তিনি করছেন, আমরা

উপলক্ষ্য মাত্র। তোমার মত ছেলের জন্য এর চাইতেও বেশী করা উচিত।

দীনেশ বল্‌ল, সে ত ঠিক কথা। শ্রীমান্‌ রমেশ, তুমি একটী বাক্যও ব্যয় করতে পারবে না। তোমার পাঁচ শ'-টাকা নিয়ে গৃহে প্রস্থান কর, টিউব-ওয়েল কর। আমাদের ব্যবস্থা আমরা করব। বড়-বৌদি' বহু বাক্য ব্যয় হয়েছে, অতএব—

তাহার মুখের কথা কেড়ে নিয়ে বড়-বৌমা বল্‌লেন, অতএব—এক—পেয়ালা চা।

নরেশ বল্‌ল, আমরাও যেন ভাগ পাই গো!

বড় বৌমা বল্‌লেন, তথাস্তু।

শেষ

এইবার টিউব-ওয়েলের কাহিনী শেষ করে' ফেলি। বল্‌বার কথাও বেশী নেই।

মাঘ মাস থেকে আরম্ভ করে' চৈত্রমাসের শেষ পর্য্যন্ত দীনেশ প্রতি সপ্তাহে আমলাবেড়ে যাওয়া আরম্ভ করলেন। আমার মেদিনী-পুরের বন্ধু হরেন্দ্রবাবু আর তাঁর ছেলে শ্রীপতি পুষ্করিণী কাটাবার সমস্ত ব্যবস্থা করে' দিলেন ; দীনেশের সঙ্গে শ্রীপতিও আমলাবেড়ে যেতে আরম্ভ করল। এরা দুইজনে এইভাবে চেষ্টা না করলে চৈত্র মাসের মধ্যেই পুকুর কাটা, আর চারটে ঘাট বাঁধানো হয়ে উঠত না। রমেশের টিউব-ওয়েলও হয়ে গেল।

তারপর প্রতিষ্ঠার কথা। সে এক মহা সমারোহের ব্যাপার ! বড়-বৌমা দীনেশকে বলে' দিলেন, খরচের জন্য ভাবনা নেই ; যা' লাগে আমি দেব ; কোন ত্রুটী যেন না হয়।

একদিন শ্রীপতিও কলকাতায় এসে কি কি করতে হবে, সমস্ত ফর্দ্দ করে' নিয়ে গেল। অধিকাংশ জিনিষই মেদিনীপুর থেকে সংগ্রহ হ'ল ; কিছু কিছু কলকাতা থেকেও নিয়ে যাওয়া হ'ল।

দীনেশ ত বলেছিল, পুকুর-প্রতিষ্ঠার অন্ততঃ সাত দিন আগে আমাদের সবাইকে আমলাবেড়ে যেতে হবে। কিন্তু, বৈশাখ মাসের প্রচণ্ড গ্রীষ্মের সময় নরেশের ছোট দুইটী ছেলে-মেয়ে নিয়ে

এত আগে সেখানে যেতে আমাদের সাহসে কুলালো না। বড়-বৌমা ত ছট্‌ফট্‌ করতে লাগলেন। প্রতিষ্ঠার তিন দিন আগে বাড়ীতে গুটি দুই বিশ্বাসী লোক রেখে আমরা আমলাবেড়ে যাত্রা করলাম। পথে মেদিনীপুরে বন্ধুবর হরেন্দ্রবাবু বাড়ীতে এক রাত্রি বাস করতে হ'ল। পরদিন, হরেন্দ্রবাবুর পরিবারের সকলকে নিয়ে প্রকাণ্ড এক রেজিমেণ্ট সাজিয়ে আমরা ঘোড়াগাড়ী, পাল্কী ও গো-যানে চড়ে' আমলাবেড়ে উপস্থিত হোলাম।

সেখানে গিয়ে সমস্ত ব্যবস্থা দেখে আমরা ত অবাক্ হয়ে গেলাম! বড়-বৌমা এই কয়দিন থেকে 'তাই ত কি হচ্ছে, কি যে হবে' বলে মহাচিন্তিত হয়ে পড়েছিলেন। তিনিও সব ব্যবস্থা দেখে খুব সন্তুষ্ট হলেন; কোন ত্রুটী দেখতে পেলেন না। নরেশ আর পরেশ ত ভেবেই ঠিক করতে পারল না, দীনেশ এত সব গোছাতে পারল কি করে'।

রমেশের বাড়ীতে ত খান-দুই ঘর ছিল, দীনেশের কাছে শুনেছিলাম। গিয়ে দেখি চার-পাঁচখানা নূতন ঘর তৈরী হয়েছে; বড় একখানি রান্নাঘরও নূতন তৈরী হয়েছে। পাছে ঝড়-জলে লোকের অসুবিধা হয়, এই ভয়ে পুকুরের চারি পাশে বড় বড় চালা বাঁধা হয়েছে। মেয়েদের স্নানের জন্য ঘর হয়েছে; অর্থাৎ যা যা দরকার সবই দেখ্‌তে পেলাম। এমন কি শ্রীমান শ্রীপতি নাড়াজোলের রাজবাড়ী থেকে তিনটে বড় বড় তাঁবুও এনে বসিয়েছে; বড় একটা দরবার-তাঁবুও এনেছে। কিছুরই অভাব দেখ্‌লুম না। আর দেখ্‌লাম রমেশের মা, আর ভগ্নীকে, তাঁরা যে কি মানুষ, মানুষ না দেবী, আমি ঠিক করতে পারলাম না।

এক ঘণ্টার মধ্যে তাঁরা একেবারে আমাদের দুই পরিবারের সকলকে যেন কত দিনের পরিচিত আপনার জন করে' নিলেন। নরেশ ত বলেই উঠল, মা, এমন মায়ের ছেলে, এমন বোনের ভাই না হ'লে কি রমেশ হয়।

রমেশ যেন বাড়ীর কেউ নয়; সে একেবারে জড়সড় হয়ে এক পাশে থাকে। সে কি করবে? কোন কিছু বল্‌তে গেলেই দীনেশ তাড়া দিয়ে ওঠে, থাক্ থাক্, তোমাকে আর সর্দারী করতে হবে না। যা' হয় আমরাই করব! বাবা, মা এসেছেন, আর ভয় কি? আর বড়-বৌদি' যখন সব বুঝে নিয়েছেন, তখন এ ব্যাপার সুসম্পন্ন হবেই।

হ'লও তাই। প্রতিষ্ঠার দিন যথাশাস্ত্র টিউব-ওয়েল আর পুষ্করিণী প্রতিষ্ঠা হ'ল। টিউব-ওয়েলের চার-পাশ সাদা পাথরে বাঁধানো হয়েছিল; তাতে একটা প্রস্তর-ফলকে লেখা হয়েছিল—

"সনাতন স্মৃতি-উৎস"

আর পুষ্করিণীর ঘাটের উপর যে শ্বেত-প্রস্তরফলক গ্রথিত হয়েছিল, তাতে লেখা ছিল—

"সনাতন-সরোবর"

রমেশের পিতার নাম সনাতন দাস। ফলকের নীচে সন তারিখ দেওয়া ছিল। প্রতিষ্ঠাতার নাম নিয়ে কি গোল হয়েছিল; রমেশ তার নাম উৎকীর্ণ করতে ঘোর আপত্তি করেছিল। সে বলেছিল, আমার গৃহিণীর নাম দিতে হবে। দীনেশ তাতে সম্মত

হয় নি ; তাই প্রতিষ্ঠাতার নাম কোনটাতেই দেওয়া হয় নি। বেশ হয়েছে।

তারপর ভোজের কথা। সে একটা দেখ্‌বার মত ব্যাপার! বড়-বৌমা বলে' দিয়েছিলেন, বড়-লোক ছোট-লোকের ভেদ থাকবে না। মেদিনীপুরের নিমন্ত্রিত সম্ভ্রান্ত লোককেও যা খেতে দেওয়া হবে, গরীব কাঙ্গালকেও তাই দিতে হবে, তেমনি করে দিতেই হবে। হয়েছিলও তাই—লুচি, তরকারী, দৈ, সন্দেশ দিয়ে প্রায় তিন হাজার লোককে পরিতোষপূর্ব্বক খাওয়াতে হয়েছিল। সকলেই একবাক্যে বল্‌ল, এমন ব্যাপার এ অঞ্চলে আর কখন হয়নি।

রাত্রি প্রায় এগারটার সময় দীনেশ এসে যখন বড়-বৌমাকে প্রণাম করতে গেল, তখন তিনি বল্‌লেন, ঠাকুর-পো, প্রণাম আমার প্রাপ্য নয় ; এই বাবা মা বসে' আছেন, আগে ওঁদের প্রণাম কর, তার পর রমেশের মা, দিদিকে প্রণাম কর, তারপর দুই দাদাকে আর শ্রীপতিবাবুকে, তা' হলেই আমার সব পাওয়া হ'ল। সার্থক হয়েছে তোমার শ্রম! ধন্য হয়েছেন—তোমার মাতা পিতা! আর ধন্য হয়েছি আমরা, তোমার মত দেবর পেয়ে।

তারপর আর কি? রমেশের মা, দিদির অনুরোধে আরও তিন দিন আমালাবেড়েতেই কাটিয়ে, একরাত্রি মেদিনীপুরে হরেন্দ্রবাবুর বাড়ীতে আতিথ্য গ্রহণ করে' কলকাতায় ফিরে এলাম।

এই খানেই আমার কথা শেষ করলে হ'ত ; কিন্তু আর দু'টী কথার উল্লেখ করতে হবে। রমেশকে বাড়ীতে থেকে চাষ করতে দেওয়া হয় নাই ; পরেশের স্কলারশিপের সব টাকা দিয়ে কলকাতায় একটা প্রেস করে' দেওয়া হয়েছে ; রমেশই তার স্বত্বাধিকারী।

আমার অনিচ্ছাসত্বেও পরেশ আর রমেশের জিদে এই প্রেসের নাম দেওয়া হয়েছে "যোগেন্দ্র প্রেস।"

আর একটা কথা—তিন মাস শুধু এই অনুষ্ঠানের জন্য মোটেই পড়াশুনা করতে না পারলেও কয়েকমাস পরে বি-এস-সি পরীক্ষায় দীনেশ কেমিষ্ট্রীতে অনারে ফার্ষ্ট ক্লাস ফার্ষ্ট হয়েছিল। এই সংবাদ যেদিন পাওয়া গেল, সেদিন বড়-বৌমা দীনশকে আশীর্ব্বাদ করে বলেছিলেন, ঠাকুরপো, এ তোমার সদনুষ্ঠানের পুরস্কার। কখনও ভুলো না ভাই, ভগবান পুণ্যের পুরস্কার দিয়ে থাকেন। আশীর্ব্বাদ করি, যে পিতার ঔরসে, যে মায়ের গর্ভে তোমার জন্ম, তাঁদের নাম উজ্জ্বল কর।

দীনেশ বল্‌লে, যাই বল বড় বৌদি', তোমার অতুলনীয় স্নেহই যেন আমার জীবন-পথে একমাত্র পাথেয় হয়।

আমি বল্‌লাম, এই ঠিক কথা, বাবা দীনেশ, এই ঠিক কথা

— উপহারের বই —

বঙ্কিম-জীবনী—শ্রীশচীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	৩৲
রামচন্দ্র—রায় শ্রীজলধর সেন বাহাদুর	১৲
লঙ্কেশ্বর—কবিশেখর শ্রীকালিদাস রায়	৷৷৶৹
গৌতমের-গতজন্ম—সুকবি শ্রীনরেন্দ্র দেব	১৲
ভারতের পিতামহ—শ্রীপ্রেমাঙ্কুর আতর্থী	৷৷৶৹
ভারতের বীররাজা—শ্রীযোগেন্দ্র গুপ্ত	১৷৹
আবিষ্কারের কথা—শ্রীনৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়	৷৷৹
জাপানী উপকথা—শ্রীবিভূতিভূষণ ঘোষাল	৷৷৹
বিজ্ঞানের জন্মকথা—শ্রীনৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়	১৲
সুকন্যা—শ্রীমৃত্যুঞ্জয় চট্টোপাধ্যায়	১৲
কুন্তের ঝঙ্কার—শ্রীশচীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	১৲
মহিষী—শ্রীজগদীশ গুপ্ত	১৷৷৹
পারের আলো—শ্রীপ্রভাবতী দেবী	২৷৷৹
মহীয়সী মহিলা—শ্রীনৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়	২৲
কাব্যে-রবীন্দ্রনাথ—শ্রীবিশ্বপতি চৌধুরী	২৲

প্রকাশক

শরচ্চন্দ্র চক্রবর্ত্তী এণ্ড সন্স্

২১, নন্দকুমার চৌধুরী লেন, মাণিকতলা স্পার

কলিকাতা।